আনন্দমেলা

৪৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২০ অগস্ট ২০২৩ ৩ ভাদ্র ১৪৩০

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

প্রচ্ছদের ফটো: আইস্টক

সম্পাদক: সিজার বাগচী

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড সি পি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর, অসম আর ত্রিপুরার এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Edited by Caesar Bagchi and printed and published fortnightly by Pradipta Biswas on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata-700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 49, Issue 8
RNI Regd No. 27057/75

ফারাক পাও

২টি ছবিতে অন্তত ৮টি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তার পর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

ছবি : প্রসেনজিৎ নাথ

উত্তর: ৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১। বানরের যে লেজটা গাছ থেকে ঝুলছিল, তা অদৃশ্য হয়েছে।
২। একটি হাতি যোগ হয়েছে।
৩। গাছে ঝোলা বানরের লেজ অন্য দিকে ঘুরে গেছে।
৪। বড় জিরাফটা পাতা খাচ্ছে না।
৫। জিরাফের পিঠে একটা কাক বসে আছে।
৬। আকাশে মেঘ অনেক কমে গেছে।
৭। আকাশে কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছে।
৮। গাছে একটা বড় গর্ত দেখা গেছে।

সুদোকু

	৩	১				৫	৭	
	৪		৭		২		৮	
		৮	৫		৩	২		
	২		৮		১		৯	
	৫		৪		৭		১	
		৭	৬		৮	৩		
	৬		১		৯		৪	
	৮	৫				১	২	

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকি, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৪	৭	৩	৫	১	৯	৮	৬	২
১	৮	৫	৬	২	৩	৭	৯	৪
২	৯	৬	৮	৭	৪	১	৫	৩
৩	১	৯	২	৪	৮	৬	৭	৫
৮	২	৪	৭	৬	৫	৯	৩	১
৫	৬	৭	৩	৯	১	২	৪	৮
৯	৫	১	৪	৮	৬	৩	২	৭
৭	৪	৮	৯	৩	২	৫	১	৬
৬	৩	২	১	৫	৭	৪	৮	৯

খুদে প্রতিভা

সামনেই আসছে স্বাধীনতা দিবস। তোমার কাছে স্বাধীনতা শব্দের মানে কী? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

পরাধীন ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন নেতাজি, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, মাতঙ্গিনী, বিনয়-বাদল-দীনেশ আরও অনেক বিপ্লবীর রক্তে স্নান করে স্বাধীনতা এসেছে, এ কথা আমরা সবাই জানি। আজ স্বাধীন ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে আমার কাছে স্বাধীনতার মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, নিজের মতামত সাহসের সঙ্গে জানানো, অত্যাচারের প্রতিবাদ করা।

এক দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেখি একটা ছোট মেয়েকে আমার একটা চেনা ছেলে খুব মারছে। আমি জিজ্ঞেস করতে বলল যে, ভিক্ষে চেয়েছিল তাই ওকে মারছে। আমি ওর হাতটা চেপে ধরে ওকে বললাম, ও যদি মেয়েটাকে আর মারে, আমি ওর বাড়িতে জানিয়ে দেব। ছেলেটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এই ভাবে যদি আমরা সবাই আমাদের আশপাশে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাই, তা হলেই আমাদের দেশের স্বাধীন হওয়া সার্থক।

ক্ষুদিরাম বসু

শুভায়ুম রায়
ষষ্ঠ শ্রেণি, চাতরা নন্দলাল ইনস্টিটিউশন, চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলি।

দ্বিতীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবেলায় ছুটির দেশ ছিল বাড়ির ছাদ। সেটাই ছিল তাঁর স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোর জায়গা। আমার কাছে স্বাধীনতার মানে হল বাড়ি থেকে একটু দূরের একটা আম গাছ। বেশ পুরনো এই গাছ। আমি পড়াশোনার ফাঁকে, খেলাধুলোর শেষে এই গাছটার কাছে এক বার অন্তত যাই। কখনও নিচু ডালে একা বসে থাকি চুপচাপ। কত পাখি, কীটপতঙ্গ, কাঠবিড়ালি আসে। বুক ভরে অক্সিজেন পাই আমি। গাছের নীচে বিকেলবেলা বৃদ্ধেরা গল্পের আসর বসায়। পাখির কিচিরমিচির সব সময় লেগে থাকে ডালে ও পাতায়। এক দিন কয়েক জন লোক করাত নিয়ে গাছটার নীচে পৌঁছোয়। আমি চমকে উঠি। হাত জোড় করে তাদের বলি, "পৃথিবীতে আর কতগুলোই বা গাছ আছে? কেন কাটবে এই গাছ? মানুষ শুধু লোভে পড়ে গাছ কাটে, কাঠ বিক্রি করে। পৃথিবী থেকে গাছ লুপ্ত হয়ে গেলে কী ভাবে বাঁচবে মানুষ? বন্ধ করো এই সব।" কী আশ্চর্য, আমার কথা শুনে লোকগুলো ধীরে ধীরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছটা যেন খুশিতে ও রোদে ঝলমল করে উঠল। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এরা বেঁচে থাকলেই আমি ভাল থাকি। এদের বেঁচে থাকাটাই আমার স্বাধীনতা।

শ্রুতায়ু পণ্ডা
পঞ্চম শ্রেণি, কৃষ্ণগঞ্জ কৃষি শিল্প বিদ্যালয়, হোগলা, পূর্ব মেদিনীপুর।

গাছের শাখায় আম

তৃতীয়

স্বাধীনতা মানে আমার টিফিন বন্ধুর সঙ্গে খাওয়া,
স্বাধীনতা মানে আলপথ বেয়ে যত দূর খুশি যাওয়া।
স্বাধীনতা মানে বটের ঝুরিতে সকাল-বিকেল দোল,
স্বাধীনতা মানে কিত কিত আর কবাডিতে শোরগোল।
স্বাধীনতা মানে ভরা বর্ষায় ইচ্ছে মতো ভেজা,
স্বাধীনতা মানে পাড়া-বেপাড়ায় নতুন বন্ধু খোঁজা,
স্বাধীনতা মানে হেলানো গাছের ডাল ধরে জলে ঝাঁপ,
স্বাধীনতা মানে ইচ্ছে-ডানায় মহাকাশ থেকে লাফ।
স্বাধীনতা মানে ফেলুদার সঙ্গে কৈলাসে অভিযান,
স্বাধীনতা মানে পাঠ্য বইয়ের ঘেরাটোপ খান খান।
স্বাধীনতা মানে বন্ধুর সঙ্গে এই আড়ি এই ভাব,
স্বাধীনতা মানে অবাধ মৈত্রী ভুলে গিয়ে ক্ষতি-লাভ।
স্বাধীনতা মানে মাতৃভাষায় মন খুলে কথা বলা,
স্বাধীনতা মানে ভুল ট্রেনে উঠে অজানার পথে চলা।
স্বাধীনতা মানে আমার যা কিছু সব কিছুই তোমার,
স্বাধীনতা মানে সবার সঙ্গে মিশে যাওয়ার অধিকার।

জিৎ চক্রবর্তী
পঞ্চম শ্রেণি, ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল, কাটজুড়িডাঙা, বাঁকুড়া।

ট্রেনযাত্রার আনন্দ

চতুর্থ

১৫ অগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। ভারতবর্ষ ওই দিন ব্রিটিশদের দুশো বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্তি পায়। তা অবশ্য এমনি এমনি হয়নি। ভারতবর্ষ তো স্বাধীন হল, কিন্তু সমস্ত ভারতবাসী কি স্বাধীন হল? যারা দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে উদয়াস্ত কাজ করে, তাদের কিসের স্বাধীনতা? যে সব ছেলেমেয়ে বাচ্চা বয়স থেকে কেউ চায়ের দোকানে, কেউ কোনও রেস্তরাঁয় কাজ করে, তারা কি জানে স্বাধীনতার আসল মানে? দারিদ্রের কাছে আজও তারা পরাধীন। কিন্তু স্বাধীনতা দিবস আমরা সবাই পালন করি। তেরঙ্গা উত্তোলন, প্রভাতফেরি, শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জলযোগ সবই হয়। হয় না শুধু প্রকৃত রূপে স্বাধীনতা পালন। স্বাধীনতার অর্থ মুক্তি, মনের মুক্তি। যেখানে কোনও জীব মন খুলে মুক্তির শ্বাস নিতে পারে, সেখানেই স্বাধীনতা। সবাই স্বাধীন ভাবে বাঁচুন, অন্যদের স্বাধীন ভাবে বাঁচার সুযোগ করে দিন। আর যদি স্বাধীনতা পালন করতেই হয়, তা হলে যাদের কাছে দু'মিনিট বসার সময় নেই, তাদের অন্তর থেকে সাহায্য করে একত্রিত হয়ে স্বাধীনতা পালন করুন। স্বাধীনতা এক দিন নয়, থাকুক বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই।

ভারতীয় পতাকা

দেবার্ঘ্য ঘোষ
সপ্তম শ্রেণি, শিবলুন এসিএম
হাই স্কুল, শিবলুন, পূর্ব বর্ধমান।

পঞ্চম

স্বাধীনতা মানে মায়ের মুখেতে মিষ্টি হাসির হ্যাঁ,
স্বাধীনতা মানে খুব রেগে গিয়ে কেঁদে ফেলা ভ্যাঁ ভ্যাঁ।
স্বাধীনতা মানে ঠামির গল্পে স্বপ্নেতে ভেসে যাওয়া,
স্বাধীনতা মানে মিষ্টির আশায় লুকিয়ে ঘরেতে যাওয়া।
স্বাধীনতা মানে ফড়িংয়ের ঠ্যাঙে সুতো বেঁধে ছোটাছুটি ,
স্বাধীনতা মানে খেলার নেশায় হেসে হওয়া কুটি কুটি।
স্বাধীনতা মানে একা ক্লাসে আমি, চার দিক শুনশান,
স্বাধীনতা মানে ক্লাস ঘরে গিয়ে জোরালো বেসুরো গান।
স্বাধীনতা মানে মায়ের আদর আঁচলটা ধরে টানা,
স্বাধীনতা মানে এগুলোকে ছাড়া আর কিছু নেই জানা।

ফড়িং

মৌমিতা কর্মকার
সপ্তম শ্রেণি, মগরা
হাই স্কুল, বাঁকুড়া।

আরও যারা ভাল লিখেছে

চিত্রলেখা দাস
অষ্টম শ্রেণি, সাঁকরাইল গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া।

তিতলি মুখোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা।

দেবাংশী মিত্র
ষষ্ঠ শ্রেণি, দোলনা ডে স্কুল, কলকাতা।

মুগ্ধ আদিত্য
অষ্টম শ্রেণি, অমরপতি লায়ন্স সিটিজেন্স পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি।

মনিরা দে
ষষ্ঠ শ্রেণি, দোলনা ডে স্কুল, কলকাতা।

সমগ্না ঘোষ
দ্বিতীয় শ্রেণি, মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল, মেদিনীপুর।

অদিতি বিশ্বাস
তৃতীয় শ্রেণি, সবুজ অবুঝ শিশু অঙ্গন, হায়দরপুর, মালদহ।

অদ্রিজা ভট্টাচার্য্য
অষ্টম শ্রেণি, পাঠভবন ডানকুনি, হুগলি।

আদৃতা ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি, বোলপুর গার্লস হাই স্কুল, বোলপুর, বীরভূম।

এ বারের প্রতিযোগিতা

খরগোশের পিছনে তাড়া করে এক আজব দেশে পৌঁছে গিয়েছিল ছোট্ট অ্যালিস। এ রকম তুমি যদি যাও, কেমন হবে সেই দেশটা?

যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, আনন্দমেলার দফতরে লেখা পাঠাবে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ো বাংলা আর ইংরেজিতে। লেখার শব্দসংখ্যা ১৫০। মনে রেখো। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ছাপব। anandamelamagazine@gmail.com এই ইমেল আইডি-তেই লেখা পাঠাবে, মেলবডিতে পেস্ট করে। ফটো তুলে পাঠাবে না।

বিশ্বের ভয়ঙ্কর সব গুহা

পৃথিবীর নানা জায়গায় ওত পেতে আছে ভয়ানক সব গুহা। লিখেছেন **তিতাস চট্টোপাধ্যায়**

নীল এই গ্রহটা অনেক বড়। খানিক বুড়োও বলা চলে। অন্তত মানুষের চেয়ে তো ঢের ঢের। কিন্তু বুড়ো হলে কী হবে? এখনও সে তার দু'হাতের মধ্যে কেমন করে যেন ধরে রেখেছে অদ্ভুত সব রহস্য। মানুষ যত ভাবে, এই তো! সব জেনে ফেললাম। বুড়ো পৃথিবীটা ভাবে, হুঁ হুঁ, এখনও আরও অনেক অনেক কিছু দেখার বাকি। মানুষও আবার ছুট লাগায়। ছুটতে ছুটতে পৌঁছে যায় না-দেখা দ্বীপে, না-জানা গুহায়। কী ভীষণ দুর্গম! পৃথিবী যেগুলো মুচকি হেসে লুকিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত তার সব প্যাঁচপোচ। মানুষ খুঁজে পেলে একেবারে হয়রান হয়ে যাবে। আর মানুষও ছাড়ার পাত্র না। সে ভাবে, আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব! দেখি আমাকে কে ঠেকায়। ব্যস, রোখ চেপে যায়। একে একে পৌঁছে যায় পৃথিবীর এই সব গুপ্ত দরজায়। যত দুর্গম, যত নিষেধ, ততই যেন ঝোঁক বেড়ে যায়। তার তখন একটাই নেশা। আবিষ্কারের। ঢাকা দেওয়া, চাপা পড়া অন্ধকারের ঢাকনা সরিয়ে সবাইকে দেখানো। তাই বহু বহু বছর ধরেই অভিযানের নেশায় টগবগ করে ফুটে চলেছে মানুষ। বইয়ে মুখ গুঁজে গোগ্রাসে

গভীর গুহার অতলে ডাইভিং

পড়েছে অভিযানের গল্প। মনে মনে পৌঁছে গেছে সেই ভয়ানক বিপদসঙ্কুল জায়গায়। ঠিক এক্ষুনি যদি এই লেখা তোমাদের তেমনই কিছু জায়গায় নিয়ে যায়? উঁহু, মনগড়া নয়। নিরেট সত্যি। পুরনো পৃথিবী গভীরে, ভয়ানক বিপজ্জনক কিছু গুহায়।

ডার্ক স্টার কেভ

প্রথমেই গিয়ে পড়ি চলো উজ়বেকিস্তানে। ডার্ক স্টার কেভ। একেবারে প্রত্যন্ত একটা জায়গায় রয়েছে গুহাটা। অনেক দিন একলা একলাই পড়েছিল। মানুষ খোঁজ পেয়েছে মাত্র কিছু দিন আগে। গত শতকের শেষ দিকে। নামে যেমনি 'ডার্ক', গুহাটাও আসলে তেমনি। একেবারে ঘন অন্ধকার। ধরো যদি মনে করো, সুড়ুৎ করে একেবারে গিয়ে গুহায় ঢুকে পড়ব। তা সে যতই ট্রেনিং থাক, ব্যাপারটা এত সহজ না। গুহাটার বেসক্যাম্পে ঢোকাই নাকি চাট্টিখানি কথা না। একটা বেশ খটমট পথ আছে। তাতে করে অন্তত দিন কয়েক হাঁটতে হবে। তো সে সব সামলে যদি গুহার সামনে এসেও পড়ো, গুহার হাঁ মুখে ঢুকতে গেলে দড়ি ধরে ঝুলে পড়তে হবে! রোপ-ক্লাইম্বিং আর কী। তার পর মাইলের পর-মাইল গুহা। যেতে যেতে মনে হতে পারে, এ তো চলেছি তো চলেছিই। হয়তো পাতালে গিয়ে থামব! খুব ভুল না। গুহাটা যেন একেবারে চলে গেছে পৃথিবীর পেটের মধ্যে। গুহার যে শেষ জায়গাটা, সেটার গভীরতা কি কম? প্রায় তিন হাজার ফুট। মিছিমিছি কি আর একে লোকে 'এশিয়ার ভূগর্ভের এভারেস্ট' বলে! কনকনে ঠান্ডা বাতাস, বরফের হ্রদ আর অন্ধকারে মোড়া এই গুহা। যদি ঢুকতেই হয়, তা হলে কিন্তু সব আটঘাট বেঁধেই ঢোকা ভাল। ঠিক মতো

ডার্ক স্টার কেভের গভীরে

পোশাক, খাবার মজুত করে। আর না হলে? ঢোকা যাবে ঠিকই। কিন্তু পৃথিবীর আলো আর দেখা যাবে না। অন্ধকারে, বরফে থাকতে থাকতে জলজ্যান্ত মানুষগুলো যে কখন মমি হয়ে যাবে, কেউ জানতেও পারবে না। এমন কিন্তু ঘটেছেও। গুহায় গেলে আজও দেখা যায় সে সব চিহ্ন। বলা নেই, কওয়া নেই, মমি হয়ে যাওয়া কিছু প্রাণী। কবে যে তারা নিজেদের এই নিয়তি ডেকে এনেছিল কে জানে! তাই আপাতত বাইরে থেকেই দ্যাখো। আর সত্যি সত্যিই যদি এ গুহার রাস্তায় পা বাড়াতে চাও, তা হলে কিন্তু সব কিছু বুঝে... তবেই। গেলেও, শেষ অবধি কী আছে তা কিন্তু জানা যাবে না। কেননা এখনও আমরা, মানে মানুষেরা গুহাটার শেষ অবধি যেতে পারিনি। তাই সেখানে যে আর কী কী বিপদ অপেক্ষা করে আছে...

নাইকা মাইন কেভ

উজ়বেকিস্তান থেকে এসে পড়লাম একেবারে মেক্সিকোয়। আচ্ছা, আগে বলো তো, গুহা কথাটা বলতে কেমন চেহারা চোখে ভাসে? জমাট বাঁধা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ঠান্ডা... এ রকমই তো? তা হলে বাপু বলে রাখি, এ গুহা সে গুহা নয়। উজ়বেকিস্তানের আর-একটু হলে ঠান্ডায় মমি হয়ে যাওয়া গুহাটা থেকে এসে পড়েছি মেক্সিকোর এক ভয়ানক বিচ্ছিরি গরম গুহায়। নাইকা মাইন কেভ। ২০০০ সালের আগে মানুষ জানতই না যে তাদের পৃথিবীতে এমনি এক খান গুহা রয়েছে। ঠান্ডা নয়, স্যাঁতসেঁতে নয়। বরং বছরভর এই গুহার তাপমাত্রা থাকে ১২২ ডিগ্রি। নাহ, ছাপার ভুল না। ঠিকই পড়ছ। কখনও কখনও আবার প্রকৃতির উদ্ভট খেয়ালে সেটা আরও বেড়ে ১৩৬ ডিগ্রি

মনিষ্যি গলতে পারে না, তাই যাওয়ারও প্রশ্ন নাই! পড়েই অভিযানের স্বাদ মেটাও আর কী! বরং, আমরা বেরিয়ে পড়ি পরের অভিযানে, থুড়ি পরের গুহায়।

পুয়ের্টো প্রিন্সেসা

গুহাও যেমন, নদীও তেমন। পুয়ের্টো প্রিন্সেসা। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী-গুহা। দেখলেই মনে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ তৈরি হয়। আগের দুটো গুহার চেয়ে একেবারে অন্য রকম। যাই হোক, মেক্সিকো ছাড়িয়ে আমরা এখন এসে পড়েছি ফিলিপিন্সে। এই গুহা-ঘেরা নদীতে মানুষ যায়। সবুজ জল পেরিয়ে। নৌকা চেপে। আস্তে আস্তে কমে আসে পৃথিবীর আলো। তার পর শুরু অন্য জগৎ। অন্ধকারের গুহা। যাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু উঠল বাই তো কটক যাই... এমনি করে যাওয়া মোটে চলবে না। এখানে ঢুকতে গেলে, গুহা দেখতে গেলে, আগে লিখিত অনুমতি চাও। তার পর যদি সেটা পাও, তবে যাওয়া যাবে। তখন চড়ে বসতে হবে বোটে। জলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে যেতে দেখে নিতে হবে পৃথিবীর কবেকার তৈরি এই শিল্পকে। শিল্পই তো! নদী আর গুহার। পৃথিবী জুড়ে এমন বেশ কিছু নদী-গুহা আছে বটে। তবে এত ভয়ঙ্কর না তারা।

পুয়ের্টো প্রিন্সেসার ভিতরে

স্ফটিকের গুহা নাইকা মাইন

নাইকা মাইন, চার দিকে ঘিরে আছে শুধু স্ফটিক

অবধি হয়েছে। কিন্তু এত গরম কেন? কারণ এর নীচে রয়েছে ম্যাগমা। তাপমাত্রা তো বেশি বটেই, গুহার ভিতর আপেক্ষিক আর্দ্রতাও কম নয়! সব সময় ১০০ শতাংশ। একেবারে অগ্নিকুণ্ড বলা যেতে পারে! তাও মানুষ এই অগ্নিকুণ্ডে গেছে। না, সাধারণ মানুষ না। গেছেন বিজ্ঞানী। এর ভিতর জুড়ে তলোয়ারের মতো যেন গজিয়ে উঠেছে স্ফটিক। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্ফটিকের গুহা এই নাইকা। গুহার মধ্যেটা কেমন যেন দমবন্ধ করা। যে দিকে তাকানো যায়, শুধু রাশি রাশি সাদা সাদা স্ফটিক। পায়ের কাছে, মাথার কাছে, ঘাড়ের কাছে সর্বত্র। তার মধ্যে ভয়ঙ্কর তাপমাত্রা! তাই নাইকায় যে বিজ্ঞানীরা গেছেন, যখনই গেছেন, তাঁদের সঙ্গে থেকেছে শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র, শরীর ঠান্ডা রাখার পোশাক। না হলে ভয়ানক বিপদ। অবশ্য, বিজ্ঞানীরাও দুমদাম করে এর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন না। তাঁদেরও নিতে হয় বিশেষ অনুমতি। তাও খুব বেশি ক্ষণ গুহার মধ্যে থাকতে পারেন না। সাধারণ মানুষের ঢোকা তো বারণ ছিলই। তার পর আরও জোরালো ভাবে বারণ হয়ে গেল। সে বছর কয়েক আগের ব্যাপার। এক শ্রমিক চেষ্টা চালিয়েছিল গুহায় ঢোকার। উদ্দেশ্যটা তার নেহাত ভাল ছিল না। সে ভেবেছিল, ঢালাও স্ফটিকের মধ্যে থেকে কয়েকটা স্বচ্ছ স্ফটিক চুরি করে কেটে পড়বে। কিন্তু নীল গ্রহের ফাঁদের কথা সে বোধ হয় জানত না। এই গ্রহ তার গুহার গায়ে-মাথায় এমন বর্ম পরিয়ে রেখেছে যে, তাতে বুঝে পা না দিলে মৃত্যু নিশ্চিত! হলও তা-ই। ভয়ানক গরম গুহার মধ্যে দম বন্ধ হতে হতে লোকটা এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। পৃথিবীর মুঠোর ধন, পড়ে রইল সেই মুঠোতেই। যাই হোক, এখানে যখন

সবুজ জল ছুঁয়ে পুয়ের্টো প্রিন্সেসায় ঢোকা

এখানে একদম বোবা হয়ে চুপ করে গুহা পেরোতে হয়। টুঁ শব্দটি করেছ কী মরেছ। তুমি ভাবলে বন্ধুদের নিয়ে গুহা দেখতে যাবে, দিয়ে নৌকায় যেতে যেতে যে খল খল করে গল্পের ফোয়ারা ছোটাবে... সেটি হওয়ার জো নেই। স্কুলে যেমনি মুখে আঙুল দিয়ে থাকো, অমনিই থাকতে হবে। কী আর করা যাবে বলো! এমনটাই যে নিয়ম এই নদী-গুহাতে ঘুরে বেড়ানোর। যদি একটু শব্দ হয়েছে, তা হলেই জেগে উঠবে এই গুহার ভয়াল ভয়ঙ্কর সব বাসিন্দা। উড়ে আসবে একরাশ বাদুড়। জেগে উঠবে ভয়ানক বিষধর সাপ, কুখ্যাত বিষাক্ত মাকড়সার দল। জেগে উঠবে বলা ভুল, জেগে তো তারা থাকেই। কিন্তু শব্দ না পেলে বিরক্ত হয় না। কিন্তু ভুলেও যদি, শব্দ হয়... এক সময় ঘুরতে ঘুরতে দেখবে, গুহাটা পুরোটা দেখা হল না। কারণ গাইড নিয়ে গেলেও এ গুহার সবটুকু যাওয়া যায় না। ধরে নাও, মানা। আসলে কিছুটা জায়গা রেখে দিতে হয় গুহার অধিবাসীদের জন্যই। কিন্তু এ সব জেনেও যে বা যারা সীমা মানেনি, গাইডের কথা শোনেনি, তারাই বিপদে পড়েছে। কিন্তু তবু ভাল, আগের দুটোর চেয়ে এ গুহাটা একটু কম বিপদের। এখানটায় অন্তত যাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে এখুনি এখানে ঢুকে পড়ার তাল কোরো না। বিপদ কিন্তু ডাঁয়ে-বাঁয়ে সবেতেই। পরে না হয়, দেখে-শুনে আসবে'খন। এখনও আরও গুহা দেখা বাকি যে!

প্লুরা কেভ

পুয়ের্টো প্রিন্সেসা থেকে প্লুরা। ফিলিপিন্স থেকে নরওয়ে। দূর তো দূর! কী হয়েছে। আমরা তো এসেছি পৃথিবীর নানা রকম

প্লুরার গভীরে

প্লুরায় ডাইভিং রীতিমতো ঝুঁকির

প্লুরায় ঢোকার মুখে

গুহার ব্যাপারস্যাপার দেখতে। নরওয়েকে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলে সক্কলে চেনে। কিন্তু সূর্যের আলো পৌঁছোয় না এমন গুহাও যে সেখানে রয়েছে, সে ব্যাপারে ক'টা কথা হয়! উত্তর ইউরোপের সবচেয়ে বড় জলে-ভরা গুহা এই প্লুরা। তেরোশো ফুট গভীরতার মধ্যে অন্ধকার, শ্যাওলা, বরফ-ঘন জল নিয়ে জেগে আছে নরওয়ের এই গুহা। পৃথিবীর যেখানে আলো নেই, সেখানেই যেন রহস্য তার সব উপকরণ নিয়ে বসে আছে। আলোর পৃথিবীর মানুষকে ডাকছে। বলছে, এসো! দ্যাখো! নরওয়ের এই গুহাও তেমন। সেখানে ঢুকতে গেলে তোমায় হতে হবে ডুবুরি। প্লুরার জলে আধ কিলোমিটার মতো ডুব-সাঁতার দিতে হবে। তার পর দেখা দেবে এই রহস্যময় গুহা। ধুপ করে তুমি ডাইভ দিয়ে একেবারে গুহার একদম গভীরে চলে যাবে, তা কিন্তু করা চলবে না। তাতে বিপদ বাঁধবে। দেখা দেবে ডি-কম্প্রেশন সিকনেস। বরং ছোট ছোট পা ফেলে এগোনোই ভাল। একটু বিরতি নিতে নিতে। তাতে চাপের তারতম্যটা ফট করে বোঝা যাবে না। যত গভীরে যাবে, দেখবে জল একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা হতে লেগেছে। প্লুরার গায়ে কয়েকটা জায়গাও আছে, সেখানে বেশ বাতাস চলাচল করে। ওই রকম জায়গা দেখে দেখে বিশ্রাম নেওয়াটা বোধ হয় সুবিধের। অন্ধকার, জলে-ঢাকা গভীর গুহা। বিপদ কি এইখানেই শেষ? নাহ। গভীরতা, ডাইভিং কোনওটাই যদি তোমায় ভয় ধরাতে না পারে, তবে নির্ঘাত ভয় ধরাবে অন্য আর একটা জিনিস। এ গুহার দেওয়াল। সরু ফাঁক। দিকে দিকে ধারালো সব পাথর। সাবধান না হলেই কিন্তু সর্বনাশ! এক ঝটকায় ছিঁড়ে যেতে পারে ডাইভিংয়ের রোপ। ফেঁসে যেতে পারে ডুবুরির পোশাক! এ রকম বিপদেই পড়েছিলেন এক অভিযাত্রী। যদিও তিনি সে যাত্রায় রক্ষা পান। কিন্তু হাইপোথার্মিয়া এড়াতে পারেননি। ২০১৪ সালে মারা যান আরও দু'জন। কী হয়েছিল জানো? গুহার গভীরে তখন দু'জন অভিযাত্রী। আরও কয়েক জন আছেন, তবে এত গভীরে না। এই দু'জনের মধ্যে এক জন হঠাৎ বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে দেখলেন, পিছনে তাঁর বন্ধুটি নেই। ফের অভিমুখ বদলালেন। ফিরতে হবে। কিছুটা গিয়ে দেখলেন বন্ধুটি

কেন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে গুহা?

ধস— যে কোনও সময় হুড়মুড় করে ধসে যেতে পারে গুহার ছাদ।

বন্যা— হঠাৎ করে বদলানো তাপমাত্রায় গলে যেতে পারে গুহার বরফ। সেই জলে হঠাৎ তৈরি হতে পারে বন্যা। তখন বেরোনো অসম্ভব।

ধাঁধা— গুহা আসলে একটা গোলকধাঁধার মতো। বার বার পথ ভুল হতে পারে।

আতঙ্ক— আবিষ্কারের আনন্দ যেমন থাকে, আতঙ্কও থাকে। কিন্তু সেটা বেশি হয়ে গেলে মুশকিল। কেউ যদি অক্সিজেন মাস্ক পরে থেকে বেশি আতঙ্কিত হন, তা হলে তাঁর কার্বন ডাইঅক্সাইডই শরীরে বেশি ঢুকবে। অক্সিজেন নয়।

পরিবেশ— কোথাও শ্যাওলা-লতায় পা জড়াতে পারে। কোথাও রয়েছে ভয়ানক বাসিন্দা। কোথাও আবার শ্বাস নেওয়ার জায়গাটুকু নেই।

আটকে গেছেন গুহারই সংকীর্ণ একটা জায়গায়। ডাইভিংয়েরই একটি জরুরি তার জড়িয়ে-পাকিয়ে রয়েছে তাঁর গায়ে। আটকে গেছেন বুঝে বন্ধুটি ভীষণই ভয় পেতে শুরু করেছেন। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। কী করা যায়! তাড়াতাড়ি আর-একটা সিলিন্ডার দিতে চাইলেন বন্ধুটিকে। কিন্তু তত ক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। মাউথপিস বদলানোর আগেই জল গিলতে শুরু করেছে বন্ধুর মুখ। চোখের সামনে বন্ধুকে এ ভাবে মারা যেতে দেখে ভয়ানক ভয় পেলেন তিনি। কিন্তু উত্তেজনা কমানো দরকার। না হলে তাঁর পরিণতিও হবে তাঁর বন্ধুরই মতো। কিন্তু চাইলেও তো তিনি এক্ষুনি একেবারে উপরে উঠে যেতে পারবেন না। একেই মিনিট কুড়ি মতো সময় বন্ধুর জন্য কাটিয়েছেন ওই গভীরে। সটান উঠতে গেলে ডি-কম্প্রেশন সিকনেস আসতে বাধ্য। তাই তাঁকে ধাপে ধাপে উঠতে হবে। তিনি সামলে বেরিয়ে গেলেন। পরে যখন মৃত অভিযাত্রী সেই লোকটিকে বাকিরা উদ্ধার করতে এল, সেখানে দেখা গেল অন্য আর একটা দেহ। ওই দু'জনের অন্য এক জন নয়। আর-এক জন। ওই অভিযাত্রীর দেহ দেখে ভয় পেয়েই মারা গিয়েছেন আর এক জন। পুরো ঘটনাটা এক বার তলিয়ে ভাবো তো! কী ভয়ঙ্কর! কাজেই যেতে ইচ্ছে করলেই এই সব গুহায় ডুব দেওয়া যাবে না। এ সব বিদ্যে জেনে, অতি সাবধানে তবে ঝাঁপ দিতে হবে গভীর গুহার জলে। তবে অভিজ্ঞ হলেও যে বিপদ এড়ানো যাচ্ছে না, তা তো বুঝতেই পারছ!

ডেভিল্‌স হোল

আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মৃত্যু উপত্যকা। তার মধ্যে জেগে আছে শয়তানের গর্ত। না, কোনও রহস্য গল্পের শুরু নয়! মৃত্যু উপত্যকা, শয়তানের গর্ত... বাংলা করলে এই নামগুলোই দাঁড়ায়। মরুভূমির মতো জায়গাটার নাম ডেথ ভ্যালি। গুহাটা ডেভিল্‌স হোল। যাই হোক, নরওয়ে পার করে আমরা এসে পড়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডায়। নামে মৃত্যু, নামে শয়তান। কিন্তু তাতে কী? অভিযানপ্রিয় মানুষ যেন সে সবেও ডরায় না। আর ডরাবেই বা কেন বলো তো! নামগুলো তো কোনও না-কোনও মানুষই দিয়েছিল। তাই সব ভয়কে তুড়ি মেরে এই ডেভিল্‌স হোলে ঢোকার চেষ্টাও চলেছে। এ-ও এক

গুহায় যেতে গেলে যা দরকার

হেলমেট— মাথা বাঁচাতে হবে যে!
হেড ল্যাম্প— অন্ধকার গুহায় নয়তো দেখবে কী করে? এটা কিন্তু দুটো নিয়ো।
জুতো— বেশ শক্তপোক্ত জুতো।
আন্ডার সুট— অনেকটা জাম্পসুটের মতো। ঠান্ডা আটকাবে।
ওয়েট সুট— অনেক ক্ষণ জলে থাকতে হলে খুব দরকারি।
ওভার সুট— পুরো শরীর ঢাকা সুট। সরু জায়গা বা টানেলের জন্য।
ওয়েস্ট বেল্ট— নিজের দরকারি খুচরো জিনিস রাখার জন্য।
মোজা— দু'রকম। উলের এবং নিয়োপ্রিনের।
টুপি— চোখ-ছাড়া সারা মাথা-গলা ঢাকা পাতলা টুপি।
নি-প্যাড ও এলবো-প্যাড— দীর্ঘ ক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গে চলতে হলে।
এ ছাড়াও গ্লাভস, ব্যাগ, চেস্ট-হারনেস (বুক-পিঠের বেল্ট), অ্যাসেন্ডার-ডিসেন্ডার, কাউস টেল, খাবার জল, এনার্জি ড্রিঙ্ক, গরম পানীয়।

ডেভিল্‌স হোলে অভিযাত্রী

ডেভিল্‌স হোলে ঢোকার মুখ
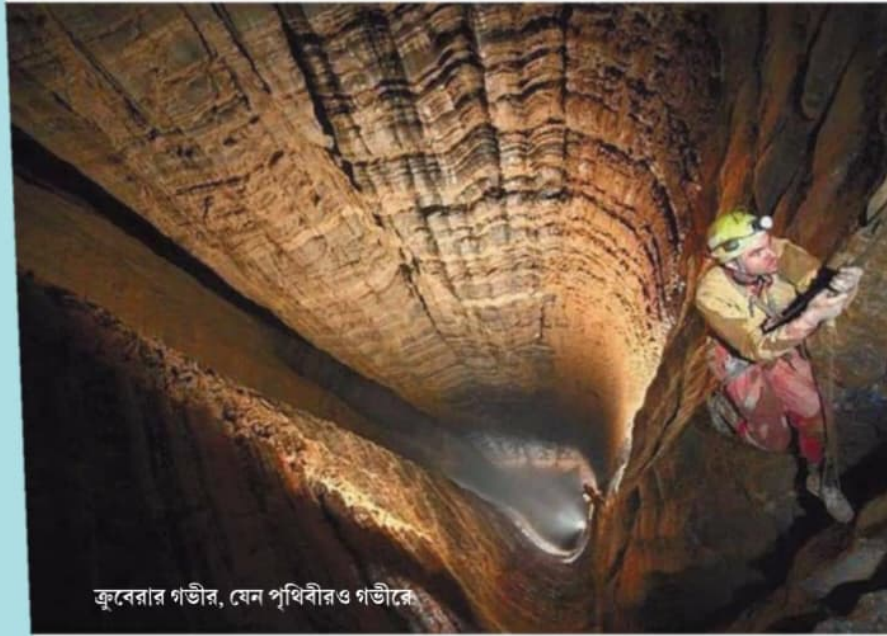
ক্রুবেরার গভীর, যেন পৃথিবীরও গভীরে

জলে-ভরা বিপজ্জনক গুহা, সন্দেহ নেই। অন্তত পাঁচ লাখ বছর আগের তো বটেই। তবে গুহায় রয়েছে আশ্চর্য নীল রঙের মাছ। নাম ডেভিল্‌স হোল পাপ ফিশ। ভীষণ দুর্লভ এই প্রজাতি। প্রায় দশ হাজার বছর ধরে রয়েছে এরা। থাকে অবশ্যি উপরের দিকটায়। সেখানে তারা নিজের মনে খাবার খায়, বাঁচে। তবে ২০১৯-এর পর থেকে ওদের বংশবিস্তার একটু যেন কমেছে। তা নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় পড়েছে বিজ্ঞানী-মহল। এই সব নীলরঙা মাছগুলো দেখলে কিন্তু মনেই হবে না গুহাটা এত গোলমেলে। এত ভয়ানক, যাকে বলে সত্যিই ডেভিল্‌স হোল। বুঝবে ভিতরে গেলে। যত ভিতরে যাবে, দেখবে আলো কমে আসছে। কমতে কমতে এক সময় মনে হতে পারে, আলোই নেই। এই কথা শুনে তোমরা বলবে, এ তো গুহার বৈশিষ্ট্য। এত ক্ষণ এত গুহা ঘুরে এ আর নতুন কথা কী! ঠিকই তো। কিন্তু নতুন যেটা, মানে যার জন্য এই গুহাটা ভয়ঙ্কর, সেটা হল গুহার আকার। কিছু দূর যেতে না যেতেই যত জটিল, প্যাঁচালো রাস্তা এসে পড়বে সামনে। চোখে পড়বে গুহার একটার পর-একটা বিপজ্জনক খুপরি। যত বড় সাহসীই হও, ভয় লাগবে। পথ যেন ধাঁধিয়ে যাবে। তবুও কৌতূহলে ডেভিল্‌স হোলে এসেছিলেন দু'জন। তা বেশ আগের কথা। গুহার গর্তের গভীরতা ঠিক কত দূর, সেইটাই তাঁরা মেপে দেখছিলেন। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারলেন না। দেহগুলো সেই যে গুহার মধ্যে হারিয়ে গেল, আর খোঁজই মিলল না। আরও এমন দু'জনের কথা জানা যায়, যাঁরা গিয়েছিলেন। তা হবে গত শতকের ষাটের দশকের কথা। ডাইভ করে গুহা দেখার নেশা পেয়ে বসেছিল তাঁদের। কিন্তু গর্তে ঢুকলেও, গর্ত থেকে আর বেরোতে দেখা যায়নি তাঁদের। কী হল ব্যাপারটা? এই ভেবে তাঁদের খুঁজতে গিয়েছিলেন এক জন। বেমালুম তিনিও ভ্যানিশ! ভয় বাড়তে থাকে ঠিকই, তবে গুহার গভীরতা নিয়ে খোঁজ-খবর থামে না। শেষমেশ পাঁচশো ফুট অবধি খবর এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তার পর? তার পরের গভীরতাটা আর কেউই জানে না। অন্তত এখনও। জানে না, আরও কী কী রয়েছে অজানা, অদেখা। দেখা যাক, কবে মানুষ এসে এই গুহার লুকিয়ে রাখা গল্পগুলো পৃথিবীর সামনে বের করে পৃথিবীকে চমকে দেয়! তত ক্ষণ তোমরা দুর্লভ এই নীল মাছগুলোই দেখো। গুহার দরজা যে হেতু চিচিং বন্ধ...

ক্রেম পুরী

ক্রুবেরা কেভ

এসে পড়েছি লাস্ট স্টপ। জর্জিয়া। এ বার যাওয়া যাক ক্রুবেরা কেভ। এর আর একখানা নাম আছে ভরোন্যা (ভরোঞ্জা)।

ভারতের বিপজ্জনক গুহা

ক্রেম পুরী গুহা: মেঘালয়ের গুহা। ক্রেম পুরী খাসি ভাষা। বাংলা করলে এর অর্থ 'রূপকথার গুহা'। মাত্র সাত বছর আগে এর আবিষ্কার। অর্থাৎ ২০১৬ সালে। পৃথিবীর মধ্যে বালি-পাথরের সবচেয়ে বড় গুহা, ক্রেম পুরী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক বার যদি ভিতরে গিয়ে কেউ পথ হারায়, তা হলে নাকি ফেরাই মুশকিল! ভয়ানক সঙ্কীর্ণ পথ। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। এমনকি ক্লসট্রোফোবিয়াও হতে পারে!

জলে ঘেরা ক্রুবেরা

শেষ গন্তব্য যখন, তখন একটু চমকদার না হলে হয়? এত ক্ষণ যে সব বিপজ্জনক, ভয়ানক গুহা দেখেটেখে এলে, তাদের চেয়েও যদি ভয়ঙ্কর কিছু থাকে, তা হলে সেটা ক্রুবেরা। গভীরতা কত জানো? সাত হাজার দুশো পনেরো ফুট। সে কী! হাঁ হয়ে গেলে কেন? দীর্ঘ দিন ধরে একে লোকে 'গুহাদের মাউন্ট এভারেস্ট' ভাবত। এই রকম সাত হাজার ফুট গভীরতা। আর কি কারও আছে? কিন্তু না। সে ভুলও ভাঙল। দেখা গেল, পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গুহা এরই পড়শি। ভেরোভকিনা। এর চেয়েও বেশ খানিকটা গভীর। গভীরতায় টেক্কা দিয়েছে ঠিকই। তবে ভয়ালতায় নয়। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক গুহা হিসেবে ক্রুবেরার সুনাম (নাকি দুর্নাম?) আছে। এর মধ্যে পাড়ি দেওয়াটা একটা ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। তাও মানুষ পাড়ি দিয়েছে। ডাইভ করতে করতে এখনও অবধি এ গুহার অনেকটাই যাওয়া গেছে। কিন্তু তার পর? কোথায় গিয়ে যে গুহাটা শেষ হচ্ছে, তা এখনও অবধি কেউ জানে না। এ গুহায় যাওয়া মানে যেন একেবারে পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরে ঢুকে যাওয়া। অদ্ভুত একটা ব্যাপার জানো তো? গুহাটা দরকার মতো বহরে বাড়তে-কমতেও পারে। অন্তত দশ কিলোমিটার! কী মনে হয় সত্যিই গুহা তো? নাকি শেষে দেখা গেল একটা বিশাল পুরনো সাপের মোটা পেট। না, না, ভয় দেখাচ্ছি না। গুহাই। ককেশাস পর্বতমালার নীচ দিয়ে এ গুহা সত্যিই প্রসারিত হতে পারে। যারা যাবে, যারা যায়, তাদের সব দিক থেকে ভয় দেখানোর জন্য একেবারে তৈরি এই গুহা। সোজাসুজি একেবারে যেন অতলে তলিয়ে গেছে গুহাটা। একটার পর-একটা গোলকধাঁধার মতো খুপরি। টেরাবেঁকা সরু জলে-ডোবা টানেল। শেষ নেই যেন। মানুষ এর খোঁজ জেনেছে আগেই। কিন্তু গিয়েছে গত শতকের ষাটের দশকে। তবে থেকেই চেষ্টা করছে এই ভয়াল ভয়ঙ্কর গুহার একদম গভীরে যাওয়ার। ২০১২ সালে এক জন যান। তবে সাড়ে ছ'হাজার ফুটের বেশি নয়। সে-ও তো গুহার অতল না? তবে কিসে বাধে? চেষ্টাও তো কম হল না। কেউ বলে পরের পর মৃত্যু, ভয় ধরায়। কেউ বলে ভূগর্ভের হাওয়ার চাপ। সে-ই নাকি যেতে দেয় না অত অতলে। তাই এখনও রহস্য, রহস্যই।

ভয় ধরাবে ক্রুবেরার ভিতর

গুহার সঙ্গে মানুষের কি আজকের যোগ? তখন না ছিল ঘর, না ছিল বাড়ি। গুহাতেই তো থাকত মানুষ। তার পর সভ্য হল। সভ্যতা এল। ঘর-বাড়ি-রাস্তা এল। কিন্তু গুহার সঙ্গে নাড়ির টান ভুলতে পারল না। সেই থেকে মানুষ খুঁজে চলেছে গুহা। নীল গ্রহটা বুড়ো হতে হতে আরও বুড়ো হয়েছে। গুহার মানুষ হয়েছে গ্যাজেট মানুষ। কিন্তু তবুও। খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে... আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো বিপজ্জনক গুহাদের দেখেটেখে তোমাদেরও কি যেতে ইচ্ছে করছে না?

ফটো: উইকিমিডিয়া কমন্স, আইস্টক, টুইটার

গল্প

পাখাওয়ালা

শুভ্রদীপ চৌধুরী

দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রভাকরবাবু চমকে গেলেন। দুটো বিষয় কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। এক, আজও ঘুম ভেঙেছে অন্য রাতের মতো তিনটে বেজে উনিশ মিনিটে।

দুই, লণ্ঠনটা টিম টিম করে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন মেঝেয়। সেটা এমন উজ্জ্বল হল কেমন করে?

প্রভাকরবাবু পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্লার্ক। সাতাশ বছরের চাকুরি জীবনে এগারো নম্বর ট্রান্সফার নিয়ে তিনি এই পাহাড়পুরে এসেছেন। নামেই পাহাড়। পাহাড়পুর পঞ্চায়েতে কোথাও পাহাড় নেই। পুরোটাই সমতল। খান সাতেক ছোট-বড় গ্রাম, বিরাট মাঠ, অজস্র পুকুর, মস্ত দিঘি, আর একটা

শান্ত নদী নিয়ে এই পঞ্চায়েত। এই নদীর নাম ফুলমণি। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ কৃষক। ঝুট-ঝামেলা তেমন নেই।

প্রভাকরবাবু একলা মানুষ। চাকরি-জীবনের শেষ বছরে এমন একটা পঞ্চায়েত অফিসই যেন খুঁজছিলেন তিনি। অফিসে জয়েন করেই বাড়ি ভাড়ার জন্য খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছিলেন। এক সহকর্মী সে সব শুনে জিজ্ঞেস করেছিল, "ভূতে বিশ্বাস আছে?"

"না, নেই।"

"এমন কথা অনেকেই বলে। দিনে বেশির ভাগ মানুষ ভূত বিশ্বাস করে না, অথচ রাতে তারাই ভূতের ভয় পায়। এ বার বলুন, রাতের দিকে ভূতের প্রতি হারানো বিশ্বাস ফিরে আসে?"

"না, আসে না।"

"আচ্ছা। খুব ভাল। গ্রামে যখন থাকবেন বলছেন, তখন আসল কথাটা বলি, দিনের বেলা গ্রাম দেখতে অপরূপ লাগে। একেবারে ছবির মতো সুন্দর, কিন্তু সন্ধে হলেই মনে হবে 'পালাই'। তাই ঘর ভাড়া না-নিয়ে পুরনো পঞ্চায়েত অফিসে কয়েকটা দিন থাকুন। নতুন ভবনে অফিস চলে আসার পর ওই বাড়ি এখন একেবারে ফাঁকা। থাকলে বলুন, সব ব্যবস্থা করে দেব।"

পুরো বাড়িতে একা থাকার প্রস্তাবে প্রভাকরবাবু যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল, "রান্নার এক জন লোক পাওয়া যাবে?"

"অবশ্যই পাবেন। এক্ষুনি খবর পাঠাচ্ছি। দেখবেন তিন-চার জন ছুটতে ছুটতে আপনার টেবিলের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। শুধু মাসের চুক্তি করবেন না। করবেন দিনের চুক্তি। কারণ তিন দিনের বেশি আপনি এই গ্রামে থাকতে পারবেন না।"

প্রভাকরবাবু চুপ করে কথাটা শুনেছিলেন। তার পর মৃদু হেসে বলেছিলেন, "পুরনো পঞ্চায়েত অফিসের একটা ঘরের চাবি আমার এক্ষুনি চাই। আজ থেকেই থাকব।"

পুরনো পঞ্চায়েত অফিস চলত কোনও মতে টিকে-থাকা এক জমিদার বাড়িতে। মস্ত দোতলা বাড়ি। নীচ তলায় বিরাট আকারের একটা ঘর বেছে নিলেন প্রভাকরবাবু। উঠোন পেরিয়ে কয়েক ধাপ গেলেই টলটলে জলের মস্ত পুকুর। বাঁধানো পাড় দখল করেছে একটা বট গাছ। এ ছাড়া চার দিকে অজস্র, আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল গাছ। সে দিনই জুটে গেল রান্নার লোক সুখলাল। বয়স্ক মানুষ, মুখে সব সময় হাসি।

কাজের মাঝে সুখলালের মুখে সেই এক কথা, "আগের স্যর আপনার মতোই ও সব বিশ্বাস করতেন না। শেষে সেই মানুষ কাউকে কিছু না-বলে কলকাতা ফিরে গেল। আপনি অন্ধকারে থাকবেন না।"

"তোমার আগের স্যর এমনি এমনি যাননি। এর চেয়ে ভাল একটা চাকরি পেয়ে কলকাতা ফিরে গেছেন। একদম মনগড়া গল্প বানাবে না।"

কাজ শেষে পরের দিন বাজারের টাকা নিয়ে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরিয়ে যায় সুখলাল। যাওয়ার আগে প্রতিদিন মিন মিন করে বলে, "লণ্ঠনটা ধুয়ে-মুছে সাফ করে ঘরে রেখে গেলাম। আকাশের অবস্থা ভাল না। এই তল্লাটে বৃষ্টি আসার আগেই কারেন্ট চলে যায়। তার উপরে কাঁঠাল-পাকা রোদ্দুর আর প্রচণ্ড গরম। কারেন্ট গেলে আর ফেরার কথা ভুলে যায়। একদম অন্ধকারে থাকবেন না। লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখবেন।"

প্রথম দিন থেকে সুখলাল বলে আসছে এ সব কথা। সুখলালের বয়স ষাট-বাষট্টি হবে। রোগা ফিনফিনে শরীর, মাথা-ভর্তি ধবধবে সাদা চুলের এই মানুষটা নিজে থেকেই কাজের জন্য এসেছিল।

প্রভাকরবাবু বলেছিলেন, "খবর পেলে কেমন করে?"

"আমার লোক ফিট করা আছে, স্যর। কাজের বড্ড দরকার। রান্না, বাজার করা থেকে বাসন মাজা সব কাজ করে দেব। আগের বাবু যা বেতন দিতেন তা-ই দেবেন," একটু থেমে আরও বলেছিল, "চাইলে ভাল একটা বাড়ি খুঁজে দেব। এই ভাঙাচোরা বাড়িতে কেউ থাকতে আসে!"

এই হল গত কয়েক দিনের ঘটনা।

লণ্ঠনটার তেজ কমিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন প্রভাকরবাবু। কারেন্ট নেই, তবু ঠান্ডা হাওয়া আসছে। গ্রামেই এ সব সম্ভব! দিনে অসহ্য গরম, রাতে ঠান্ডা। জ্যৈষ্ঠ মাসে এমন ঠান্ডা হাওয়া, ভাবা যায় না। এ সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না, কেউ এক জন হামাগুড়ি দিয়ে মেঝেয় রাখা লণ্ঠনের কাছে চলে এল। লণ্ঠনের তেজ বাড়িয়ে দিয়ে আবার দরজার বাইরে গিয়ে বসল পাখা টানতে।

সিলিং থেকে ঝোলানো টানা-পাখাটা আট হাত লম্বা। মোটা কাপড় দিয়ে মোড়া মেহগনি কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে আঁটা মসলিনের ঝালর। পাখার শরীর থেকে লম্বা একটা দড়ি নেমে এসেছে। সেই দড়ি দেওয়ালে আটকানো পিতলের চাকার উপর দিয়ে চলে গেছে দরজার বাইরে।

কানাই দাস দরজার পাশে উবু হয়ে বসে পাখা টানছে। আগে মশা খুব জ্বালাতন করত। ছেঁকে ধরত। হাত চালিয়ে ঠাস করে মারার উপায় নেই। বাবুর ঘুম ভেঙে গেলে কাজ থাকবে না। তাই দড়ি টানার সময় সারা শরীর দুলিয়ে যতটা পারে মশার অত্যাচার থেকে বাঁচার চেষ্টা করত। বহু দিন হল সেই ঝামেলা থেকে কানাই মুক্তি পেয়েছে। মশারা আজকাল তার ধারে-কাছে ঘেঁষে না। এক মনে নিজের কাজ করতে পারে।

প্রভাকর সরকার নামের মানুষটা এই পুরনো বাড়িতে এসে উঠেছেন বলেই, কাজ জুটেছে তার। হাতে কাজ না-থাকলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেই ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গে এই জমিদারবাড়ির পাখা টানতে আসা। সন্ধের দিকে ফুলমণি নদীতে ডুব দিয়ে এসে কাছারি ঘরের হাতপাখা টানা দিয়ে কাজের শুরু।

দিন প্রতি দুই আনা ছিল কাজের মজুরি। রাতে মশা আর দিনে মাছির অত্যাচার থেকে টানা-পাখা মুক্তি দিয়েছিল জমিদারবাবুদের। টানা চার ঘণ্টা পাখা টানতে হত। থামলেই মনিব বাজাত ঘণ্টা। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আবার কাজে লেগে পড়তে হত। দিনে ঘুম আর রাতে জেগে থাকা এক সময় অভ্যেস হয়ে গেল। এই কাজে খুব নাম ছড়াল। ইংরেজরা জমিদারবাবুর কাছে চিঠি পাঠিয়ে বেশ কিছু দিনের জন্য তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

শীতকাল এলে কানাইয়ের বড্ড মন খারাপ হত। কাজ নেই। তখন গ্রামের বাড়ি থেকে ডাক আসত। সেখানে গিয়েও রাতে ঘুম আসত না। রাতে চৌকির এক পাশে চুপ করে বসে থেকে আপন-মনে দড়ি টানার ভান করে যেত কানাই। দিনে ঘুম আর রাতে জেগে থাকা সে ছাড়েনি। চার ঘণ্টার পর হাত বদল না-করে, এক টানা সারা রাত পাখা টেনে যাওয়ার ক্ষমতা, তাঁর

মতো আর কারও ছিল না।

মাঝ খানে এল খসখস, টানা-পাখার সঙ্গে কলকব্জা লাগিয়ে সারা ক্ষণ পাখা চলার কথা কানে এসেছিল। তবে টানা-পাখাকে সিলিং থেকে নামাতে পারেনি। মন্দির, গির্জা, স্কুল সবখানে ছড়িয়ে পড়ল।

অবশেষে এই বিজলি বাতি এসে সব তছনছ করে দিল। আজব জিনিস! সুইচ টিপলেই জ্বলে আলো, বন বন করে ঘোরে পাখা। টানা পাখার দিন শেষ হল। সেই থেকে বিজলি বাতির উপরে খুব রাগ কানাই দাসের। এই ঘরে সারাটা জীবন পাখা টেনেছে সে। সেখানে বিজলি পাখা ঘুরবে, কানাই দাস কিছুতেই মেনে নেবে না। কাজ চলে যাওয়ার পর সে অনেক কষ্ট পেয়েছে। রাতে ঘুম নেই। দিনে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কে কাজ দেবে? মৃত্যুর আগে অনেক কষ্ট পেয়েছে সে। এখন সেই কষ্ট নেই। মৃত্যুর পর অদৃশ্য একখানা পাখা সে পেয়েছে। ঘরের বিজলি বাতির সুইচ বন্ধ করে দিয়ে সারা রাত হাতপাখা টানে। মাঝ রাতে খুব জানার ইচ্ছে হয় তাঁর, 'বাবু, বিজলি বাতির চেয়ে আমার টানা-পাখার হাওয়া ঠান্ডা না?'

সাহস হয় না। যদি আগের বাবুর মতো ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ভাল-মন্দ বোঝার আগেই মানুষ ভয় পায়।

কানাই দাস তাই চুপচাপ নিজের কাজ করে যায়। নিভু নিভু লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে কাজে কম ভুল হয়।

প্রভাকরবাবুর ঘুম ভাঙল সুখলালের ডাকে। দরজা খুলতে গিয়ে চোখে আটকে গেল ইলেকট্রিক বোর্ডে। সমস্ত ফ্যানের সুইচ অফ করে রাখা। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। ঘুমোতে যাওয়ার আগে কারেন্ট ছিল না, তবু কখনও আসবে এই আশায় সুইচখানা অন করে রেখেছিলেন। অনেক ভেবে প্রভাকরবাবু কোনও কূল-কিনারা পেলেন না। অফিসে আসতেই সহকর্মীরা ছেঁকে ধরল। এক-এক জনের এক-একটা প্রশ্ন, "আপনার ভয় নেই? সাত-আট দিন ধরে ওই বাড়িতে পড়ে আছেন!"

"রান্নার লোক পেয়েছেন?"

"রাতে ঘুম হয়?"

"সিলিং থেকে শুনেছি খস খস শব্দ আসে। আপনি সে সব কিছু শুনতে পেয়েছেন?"

প্রভাকরবাবু মৃদু হেসে বললেন, "খাসা আছি। পুরনো বাড়ি, চওড়া দেওয়াল। এমনিতেই রাতে বেশ ঠান্ডা। রান্নার লোক পেয়েছি ভাল। আপনারা চিন্তা করবেন না।"

সহকর্মীরা হতাশ হল। প্রভাকরবাবু সুইচ বিষয়ক কথা এড়িয়ে গেলেন।

পরের দিন রাতে দিব্যি ফ্যান ঘুরছিল। নীল রঙের নাইট বাল্‌ব জ্বলছিল। অথচ ঘুম

বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এক জন রোগা সাদা ধবধবে চুলের বুড়ো মানুষ বন্ধ দরজা ভেদ করে ঘরে ঢুকেই পটাপট আলো আর সিলিং ফ্যানের সুইচ বন্ধ করে বলল, "বাচ্চাকাচ্চার মতো জেদ আপনার বাবু। এত জেদ ভাল না। আমি এই ক'টা দিনে আপনার কোনও সমস্যা করেছি যে, আমায় সমস্যায় ফেলছেন?"

ভাঙল ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে। মাথার কাছে রাখা টর্চ জ্বালিয়ে প্রতি দিনের মতো দুটো জিনিস মিলিয়ে নিলেন। দেওয়াল-ঘড়িতে তিনটে বেজে উনিশ মিনিট আর সিলিং ফ্যান, নাইট বাল্‌বের সুইচড অফ।

চার দিকে নিঝুম রাত। প্রভাকরবাবু ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। এমন তারা-ভরা আকাশ তিনি আগে কখনও দেখেননি। বেশ কিছু ক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

পরের দিন ধুম জ্বর এল। অফিসে যেতে পারলেন না। সুখলাল ওষুধ এনে দিল গঞ্জ থেকে। তার পর সারা দিন তাকে ছেড়ে কোথাও গেল না।

সন্ধের দিকে প্রভাকরবাবু চাপা গলায় বললেন, "আজ রাতটা থেকে গেলে কি খুব অসুবিধে হবে?"

জিভে কামড় দিয়ে সুখলাল বলল, "রাতে আমি এখানে থাকতে পারব না। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রাখবেন। যাই।"

প্রভাকরবাবু ঠিক করলেন আজ কিছুতেই ঘুমোবেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন। কার জন্য অপেক্ষা, তিনি জানেন না। বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এক জন রোগা, সাদা ধবধবে চুলের বুড়ো মানুষ বন্ধ দরজা ভেদ করে ঘরে ঢুকেই পটাপট আলো আর সিলিং ফ্যানের সুইচ বন্ধ করে বলল, "বাচ্চাকাচ্চার মতো জেদ আপনার বাবু। এত জেদ ভাল না। আমি এই ক'টা দিনে আপনার কোনও সমস্যা করেছি যে, আমায় সমস্যায় ফেলছেন?"

বক বক করতে করতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে মানুষটা এগিয়ে এল প্রভাকরবাবুর বিছানার কাছে। হাত বাড়িয়ে প্রভাকরবাবুর কপালে ডান হাত রেখে বলল, "জ্বর তো ভালই বাঁধিয়েছেন। আমি যখন এসে পড়েছি, জলপটি দিয়ে জ্বর তাড়াব। চিন্তা নেই।"

প্রভাকরবাবু ঘাবড়ে গেলেন। বুকের ভিতরে ড্রাম পিটছে কেউ। তিনি কোনও মতে বললেন, "আপনি কে?"

"আমি কানাই দাস, পাখাওয়ালা। সেই দুই আনা মজুরি থেকে এই ঘরে পাখা টানার কাজ করি।"

প্রভাকরবাবু চাপা গলায় বললেন, "আপনি আর পাখা টানবেন না। আমার ভাল লাগে না।"

কানাই অবাক গলায় জানতে চাইল, "কেন?"

প্রভাকরবাবু বললেন, "আমি ঘুমোব আর কেউ সারা রাত জেগে আমার জন্য পাখা টানবে, এমন ঘুম আমার চাই না।"

কানাই দাস ধরা গলায় বলল, "এমন কথা প্রথম শুনলাম বাবু। চোখ ভিজে এল। তবে কি আমি এই বাড়ির মায়া ছেড়ে চলে যাব?"

প্রভাকরবাবু বললেন, "না, আপনি কোথাও যাবেন না। এখানে অনেক ঘর। একটা ভাল ঘর বেছে নিয়ে থাকুন। মাঝে-মধ্যে আসবেন, কথা হবে। আর শুনুন, যাওয়ার আগে সিলিং ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে যাবেন।"

কানাই দাস কোনও মতে বলল, "ঠিক আছে বাবু।"

আনন্দে এখন তার দু'চোখ ভাসছে জলে।

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

ভয়, ভীতি ও ভন্ডুলকুমার...

রাবণ

ছন্দা বিশ্বাস

প্রকাশক রেশম সেন প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, এই মি. বার্ডান লোকটা কে বলুন তো?"

সম্পাদক অনবিত বললেন, "উনি বিদেশে থাকেন এইটুকুই জানি। সান ফ্রান্সিসকো থেকে লেখা পাঠান ইমেলে। এখনও পর্যন্ত সে ভাবেই লেখা নিয়েছি। ফোনে যার সঙ্গে কথা হয়, শুনলাম

উনি ওঁর সহকারীদের এক জন। তিনিই সর্বেসর্বা।"

"লেখকের সঙ্গে কখনও কথা হয়েছে?"

"নাহ, কিছু জানতে চাইলে সহকারী বলেন, 'যা বলার আমাকে বলুন, আমি জানিয়ে দেব,'" অনবিত বললেন, "একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন? গত তিন বছর ধরে মি. বার্ডান যে ক'টা লেখা পাঠিয়েছেন, প্রত্যেকটাই পাঠকপ্রিয়। এ বারের উপন্যাসটাও তো বেস্ট সেলার!"

"কত ধরনের লেখা লিখেছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ে লেখা উপন্যাসের প্রতিটিই এক একটা মাস্টারপিস," মিস্টার সেন সংযোজন করেন, "সব দিকেই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মনে হচ্ছে ইংরেজি, বাংলা, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান এবং স্প্যানিশ ভাষার সমস্ত সাহিত্য তাঁর নখদর্পণে।"

অনবিত বলেন, "তিন বছর আগে ওঁর উপন্যাস পড়ে তাজ্জব বনে যাই। সে দিন একটা কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস পড়লাম, যাকে বলে আনপুটডাউনেবল।"

"একটা কথা জানা দরকার, ওঁর অন্য আর কোন কোন ভাষায় বই আছে? আর ওঁর সত্যিকারের পরিচয়টা জানার জন্যও কৌতূহল হচ্ছে।"

অনবিত সোফা ছেড়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "একই কৌতূহল আমার হওয়ায় এই ব্যাপারটা জানার জন্যেই এক জনকে কাজে লাগিয়েছি।"

"কে তিনি?"

"ইনভেস্টিগেটর। আমার বিশেষ পরিচিত। বেশ কিছু দিন ধরে 'রাবণ' ছদ্মনামে লেখা বেশ কিছু উপন্যাসের বাজারে বিপুল কাটতি দেখে ওঁর সম্পর্কে জানার জন্য আমিও দারুণ কৌতূহলী। এক জন মানুষের বিভিন্ন দিকের উপরে এত জ্ঞান কী ভাবে সম্ভব? এ বারে সর্ব মোট পনেরোটা উপন্যাস এসেছে মার্কেটে। অন্য সাহিত্যিকেরাও কানাঘুষো করছেন, 'কে এই রাবণ?' আর 'এত লেখা লিখছেন কী ভাবে?'"

"লেখাগুলো জলবৎ তরলং নয় মোটেও। বরং বেশ উঁচু দরের সাহিত্য বলা যেতে পারে।"

অনবিত বললেন, "এক দিন ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই লেখালিখি ছাড়া উনি আর কী করেন? বললেন, উনি পেশায় এক জন চিকিৎসক।"

"চিকিৎসক? তার পরেও এত লেখা লেখেন কখন?"

সে দিন পত্রিকা অফিসের কনফিডেনশিয়াল মিটিংয়ে অনবিত আর রেশম সেনের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার সময়ে ঋদ্ধিম উপস্থিত ছিল।

অনবিত একটি প্রথম শ্রেণির বাংলা পত্রিকার সম্পাদক। তিনি যে পত্রিকা অফিসে চাকরি করছেন, সেখানে ছোটদের পত্রিকা ছাড়া আরও তিনটি পাক্ষিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অনবিত প্রকাশককে বললেন, "বেশ কয়েক বছর আগে এমন এক জন রাইটার ছিলেন, প্রবাহ কর নামে। মাত্র কয়েক বছরে তিনি খুবই বিখ্যাত হয়েছিলেন। আমাদেরই বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত লেখা পাঠাতেন। ছোট কিংবা বড় সব লেখাই ছিল অসাধারণ। যেমন ভাষা, তেমনই নিত্যনতুন বিষয়। পুরনো ফাইল খুললে নজরে পড়বে।"

"কত বছর আগে বলুন তো?"

"তা বছর দশেক তো হবেই।"

ঋদ্ধিম বছরপাঁচেক হল এখানে কাজ করছে। তাই তার দৃষ্টি এক বার অনবিত আর এক বার রেশম সেনের দিকে ঘুরছে ফিরছে। মনে মনে সে-ও কয়েক বার সেই লেখকের নাম আওড়াল, 'প্রবাহ কর, প্রবাহ...'

অনবিত বললেন, "এ বারে শারদীয়ার জন্যে মি. বার্ডান চারটে উপন্যাস পাঠিয়েছেন। তিনটে বড়দের পত্রিকার জন্য আর একটা ছোটদের পত্রিকার কথা ভেবে লেখা। সম্পাদকমণ্ডলী সেই চারটে উপন্যাস পড়ে এমনই মুগ্ধ যে একটাকেও বাদ দিতে রাজি নন।"

সে দিনের মিটিংয়ে উপস্থিত এক জন লেখক বললেন, "আমার স্থির বিশ্বাস, এই চারটে উপন্যাসই এ বারে বাজার মাতাবে।"

"সেটা তো না হয় হল, কিন্তু শারদীয়ায় তো আর এক জন রাইটারের এক সঙ্গে চারখানা উপন্যাস ছাপা সম্ভব নয়। আমাদের তো আরও রাইটার আছেন। বছরের পর-বছর তাঁরাও শারদীয়া পত্রিকায় একটা উপন্যাস প্রকাশের অপেক্ষায় থাকেন।"

"কিন্তু লেখাগুলো এতটাই উচ্চ মানের যে কোনওটাকে বাদ দিতে মন চাইছে না।"

॥ ২ ॥

ঋদ্ধিম বলল, "আচ্ছা অনবিতদা, এই মি. বার্ডান লোকটার বাড়ি কোথায়?"

অনবিত বললেন, "উনি আমেরিকায় থাকেন। প্রবাসী ভারতীয়, জন্মস্থান কলকাতা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ওঁর মাতৃভাষা নাকি বাংলা।"

"হতে পারে, মা হয়তো বাঙালি, বাবা ব্রিটিশ।"

"আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ওঁর ঝুলিতে জার্মান ভাষার আন্তর্জাতিক পুরস্কারও আছে।"

"এ তো তাজ্জব ব্যাপার। এক জনের এত ক্ষমতা থাকতে পারে, সত্যি অবিশ্বাস্য! গড গিফ্টেড যাকে বলে!" ঋদ্ধিম বিস্ময় মাখা সুরে বলল।

"ঠিক তা-ই। সে বার প্যারিসে যে সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে মি. পি কে বার্ডানের আসার কথা ছিল। কী একটা কারণে তিনি আসতে পারেননি। অনেকেই দারুণ কৌতূহলী ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে। অনেকেই খোঁজ নিচ্ছিলেন মি.

বার্ডানের। তিনি কখন আসছেন, কোন ফ্লাইটে, কোন হোটেলে চেক ইন করছেন ইত্যাদি খবর জানতে মিডিয়াও খুবই তৎপর।"

সে দিন মিটিংয়ের পরে অনবিত আর্কাইভ খুলে টেনে টেনে বের করল পনেরো বছর আগেকার ফাইলগুলো।

দুটো লেখা পড়ে অনবিতের যেন ঘোর লেগে রইল। ও আরও কিছু লেখা বের করে রাখল। আগামী দিন এসে পড়বে।

পরের দিন ছোটদের পত্রিকার

সম্পাদক রাতুল মিত্রের কাছে গিয়ে বলল, "আচ্ছা রাতুলদা, এই প্রবাহ করের নাম বলছিলেন না? এক দিন ওঁকে ফোন করলে কেমন হয়?"

"করে লাভ নেই, উনি এখন আর কলকাতায় থাকেন না।"

"কোথায় থাকেন, জানেন কিছু?"

"জানি না রে, তবে শুনেছিলাম উনি সম্ভবত বেঁচে নেই।"

"বেঁচে নেই?"

"হুম," পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন রাতুল, "এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় মুম্বইয়ের একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, এই পর্যন্ত জেনেছিলাম। তার পরে যে কী হল জানি না। বহু কাল আগের কথা, তখন আমিও নতুন চাকরিতে ঢুকেছি। সবাইকে চিনিও না। তবে একটা তথ্য পেয়েছিলাম, প্রবাহ কর নামটা আসলে আমাদের পত্রিকা অফিস থেকেই ভুল করে ছাপা হয়েছিল। ওঁর আসল নাম ছিল প্রভা কর।"

"মহিলা রাইটার?"

"হুম।"

উদ্‌যাপন মি. বার্ডানের সদ্য পাঠানো লেখাটা মন দিয়ে পড়ছে এখন। এ বারে উনি কল্পবিজ্ঞানের উপরে লেখা একটা উপন্যাস পাঠিয়েছেন। যেমন অদ্ভুত কনসেপ্ট, তেমনই কাব্যময় সংলাপ! এমন সুন্দর লেখা এর আগে তিনি পড়েছেন বলে মনে হয় না।

॥ ৩ ॥

সে দিন পরাশরের কাছে এসেছিলেন দীর্ঘ কালের বন্ধু অনবিত। পরাশর অরণ্য ইদানীং ইনভেস্টিগেটর হিসেবে খুব নাম করেছেন। অনেকগুলো জটিল রহস্যের সমাধান করেছেন দ্রুত। পরাশরের কাছে অনবিত বিষয়টা তুলতেই পরাশর গড়গড় করে মি. বার্ডন সম্পর্কে অনেক তথ্য বলে দিলেন!

"সে কী! তুই ওঁর সম্বন্ধেও এত সব জানিস?"

"জানতে হয় বন্ধু, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়।"

অনবিত বললেন, "তুই কি এ খবর জানিস যে ওঁর জন্ম কলকাতায়, মাতৃভাষা বাংলা?"

"নাহ, সেটা তো জানা ছিল না। তবে কয়েক বছর ধরে যে ওঁর উপন্যাস বাজার কেড়েছে, সেটা জানি। পড়েওছি কিছু কিছু লেখা। জাস্ট অসাম! আরও জেনেছি, এ বছর তাঁর সাড়াজাগানো উপন্যাস, 'দ্য ফিউচার ওয়ার্ল্ড'। এক জন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক, এক জন রোবোটিক ইঞ্জিনিয়ার এবং এক জন লেখক— এই তিন চরিত্র নিয়ে উপন্যাস এগিয়ে চলেছে। এক জন রোবট এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়ন তুলেছে। তার নাম হল ডেল্টা জ়িরো ওয়ান। এই মুহূর্তে সে হারিয়ে দিয়েছে আইবিএম-এর আবিষ্কার, আলফা জ়িরোকে। ডেল্টা আড়াই লক্ষ গেম খেলেছে আলফা জ়িরোর সঙ্গে। প্রায় সব ক'টায় সে জিতেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই ডেল্টা জ়িরো ওয়ান বিজ্ঞানজগতের সমস্ত বিস্ময়কে ছাপিয়ে যেতে চলেছে।"

"কী সেটা?"

"বলছে মাত্র কয়েক মাসের ভিতরে সে জানাবে, ভিনগ্রহের এক লুপ্ত সভ্যতার হদিস। এক উন্নত সভ্যতার খোঁজ! আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগের সভ্যতা। যাদের আবিষ্কার চমক লাগিয়ে দেবে গোটা বিশ্ববাসীকে।"

"আচ্ছা, এই ডেল্টা জ়িরো ওয়ান কি এক জন লেখক?"

"কী না তিনি! খোঁজ নিয়ে জেনেছি তিনি এক জন বিজ্ঞানী, মস্ত বড় সার্জেন, দক্ষ দাবাড়ু, অন্য দিকে বেস্ট সেলার রাইটার। তেরোটা ভাষার উপরে তাঁর অপরিসীম দক্ষতা। ফরাসি, জার্মান, ইটালি, স্পেন, তুর্কি, রুশ ভাষার সাহিত্য সব গুলে খেয়েছেন।

পরাশরকে অনবিত বলল, "সে দিন উপন্যাসটা পড়ার পরে কিছু ক্ষণ বসে থাকলাম। কী জটিল মনস্তত্ত্ব রে বাবা! কী ভাবে ধরে রাখে এত কিছু এইটুকু মস্তিষ্কে। আগামী পৃথিবীর তিন ভাগ রোবট আর এক ভাগ মানুষের ভিতরে দ্বন্দ্ব। আর সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করছেন এক জন সাইকোলজিস্ট। কী সুন্দর লেখাটা!"

এটা একটা রোবটের লেখা, কিছুতেই মানতে নারাজ অনবিত। রোবট কী ভাবে এতটা সংবেদনশীল হতে পারে?

॥ ৪ ॥

এর পরে কেটে গেছে বেশ কিছু দিন। আজ উল্টে পরাশর এসেছেন অনবিতের গড়িয়ার বাড়িতে।

গত কালই ফিরেছেন ইউএসএ থেকে। জেট ল্যাগ কাটিয়ে উঠতে না-উঠতে বেরিয়ে পড়লেন।

অনবিত বাড়িতে ছিলেন। দরজা খুলে পরাশরকে দেখে বললেন, "তুই ফিরেছিস কবে?"

"কালই।"

"আয় আয়, আমি তো তোর কাছেই যাব বলে বসে আছি।"

এর পরে পরাশরের মুখ থেকে রহস্যজনক খবরটা শুনে রীতিমতো ভিরমি খেলেন অনবিত। অনবিত চুপ করে পরাশরের কথাগুলো শুনতে লাগলেন।

"তোর কথা মতো রাইটার প্রভা করের খোঁজ করলাম, যিনি প্রিন্টিং মিসটেকে এক সময়ে প্রবাহ কর হয়ে গিয়েছিলেন। সে বারে তাঁর পাঠানো সেই গল্প মাস্টারপিস হিসেবে গণ্য হলে, তিনি তার পর থেকে এই নামেই লিখতে লাগলেন। এই প্রভা কর এক দিন একটা পথ-দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মুম্বইয়ের একটা হাসপাতালে ভর্তি হলেন।

"মস্তিষ্ক সচল থাকলেও তাঁর অন্যান্য অঙ্গ দ্রুত অকেজো হয়ে পড়ছে দেখে ওঁকে আমেরিকায় পাঠানো হল, উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য। ওঁর খুব কাছের মানুষের সাহায্যে দ্রুত এয়ার-অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হল।

"এ বার আমেরিকার যে হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হল, সেই নিউরো সার্জেনের অধীনে এক জন রোবটিক সার্জেন ছিলেন। তিনি আদতে এক জন রোবটিক ইঞ্জিনিয়ার। সেই নিউরো সার্জেনের বহু দিনের স্বপ্ন ছিল এক জন রোবট রাইটার তৈরি করা। তাঁর কথা মতো রোবটিক ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য বইয়ের কনটেন্ট তাঁর মেমরিতে ভরে নিলেন।"

"ইনিই কি ডেল্টা জ়িরো ওয়ান?"

"এগজ্যাক্টলি!"

"বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি ধ্রুপদী সাহিত্য ছাড়াও আধুনিক বিভিন্ন জঁরের নানা গল্প- উপন্যাস ভরে দেওয়া হল তাঁর নিজেরই মগজে। কিন্তু সেই রোবটের লেখায় কিছুতেই মানবিক দিকগুলো সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হচ্ছিল না। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সহানুভূতি, মহানুভবতা... এ সব

রূপচিত্র আঁকতে তিনি ব্যর্থ হচ্ছিলেন।

"ঠিক সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে প্রভা কর উপস্থিত হলেন। তাঁকে বাঁচানো গেল না। অথচ তখনও পর্যন্ত প্রভা করের মস্তিষ্ক সচল ছিল। এ বার সেই নিউরো সার্জেনের কথা মতো প্রভা করের ব্রেনের হাইপোথ্যালামাসের বিশেষ অংশ ডেল্টা জ়িরো ওয়ান রোবটের মস্তিষ্কে সংযোজন করা হল। ব্যস, কেল্লা ফতে!

"সেই রোবটেরই নতুন নাম দেওয়া হল, মিস্টার পি কে বার্ডন।"

"ওহ্, এ বার বুঝতে পেরেছি, রাইটার প্রভাকর বর্ধন যিনি ইংরেজিতে লিখতেন, পি কে বার্ডন।"

"হ্যাঁ। সে-ই হল ডেল্টা জ়িরো ওয়ানের রাইটার সত্তা। যাঁর ছদ্মনাম হল 'রাবণ'। একাধারে তিনি এক জন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। দারুণ সব প্রোগ্রামিং করছেন। আবার হার্ডওয়্যার চ্যাপ্টার গুলে খেয়েছেন। প্রয়োজনে নিজেই বহু মেশিনারি পার্টস বানাচ্ছেন। সেগুলো অ্যাসেম্বল করছেন। এ ছাড়াও শুনছি, এমন একটা রোবট বানাতে চলেছেন, যেটা হবে বিশ্বসেরা। তার মস্তিষ্কে এমন সব তথ্য ভরা হয়েছে, যার দরুন সে নাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্মরহস্যের হদিস দিতে পারবে। জানাতে পারবে, অন্যান্য গ্যালাক্সির হাঁড়ির খবর।"

"তার মানে এত কাল যার লেখা নিয়ে পাঠক এমন মাতামাতি করছে, সে আদতে এক জন রোবট?"

"ঠিক রোবট নয়, রোবট-মানুষ। রোবটের মাথায় মানুষের ব্রেন ঢোকানো হয়েছে। তার জন্যই তো এমন ইমোশন লেখায়! এ যাবৎ যে সমস্ত লেখা পেয়েছি তাতে ইমোশন ছিল না। অথচ লেখক রাবণের স্বাদু গদ্য, কী অ্যাডভেঞ্চারে, কী কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিতে! বিভিন্ন ভাষার উপরে হাজারের মতো উপন্যাস আছে এই ডেল্টা জ়িরো ওয়ান নামের রোবটটির। সারা বিশ্বের বাজার কেড়ে নিয়েছে একাই এই ডেল্টা জ়িরো ওয়ান।"

অনবিতের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এত দিন ও যাঁর সঙ্গে ইমেল চালাচালি করত, তিনি এক জন বিখ্যাত রোবট! ডেল্টা জ়িরো ওয়ান!

অনবিতের চোখে এখনও ঘোর লেগে আছে। এই কথাগুলো পরাশর ছাড়া অন্য কেউ বললে, অনবিত হয়তো বিশ্বাসই করত না।

পরাশর বললেন, "সত্যিই তিনি দশ মাথার বুদ্ধি ধারণ করেন। আর কুড়িটা হাতের সমান কাজে দক্ষ। আমি যখন গেছি তখন দেখি, ডেল্টা জ়িরো ওয়ান ওঁর নিজস্ব ল্যাবে অ্যাস্ট্রোনমির গবেষণায় ব্যস্ত। নেপচুন প্ল্যানেটের উপরে কাজ করছেন। কি-বোর্ডে টাইপ করছেন আর দেওয়ালে জায়ান্ট স্ক্রিনে যে সব জটিল ইকুয়েশন কষছেন, সেগুলো দেখা যাচ্ছে।

"অঙ্ক যে এত বিশাল চেহারার হতে পারে, আমার ধারণার বাইরে ছিল। ত্রিকোণমিতি, ডিফারেনশিয়াল জিয়োমেট্রি, স্ট্যাটিস্টিক্স, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস সব মিলেমিশে কী যে করছেন... সে সব আমার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

অনবিতের চোখ তখনও ছানাবড়া।

ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

▶ আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।

▶ ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।

▶ গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।

▶ গল্পের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে রাখাই ভাল।

▶ গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

▶ ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।

▶ গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamela@abpmail.com

মূল মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ

অচেনা মাসরুর

হিমালয়ের এই অসমাপ্ত মন্দিরের কথা জানেন না অনেকে। সেই মন্দির ঘুরে লিখেছেন **সঞ্জীব চৌধুরী**

হিমাচল প্রদেশের ম্যাকলিয়ডগঞ্জের হোটেল ম্যানেজার মিসেস সেবাস্টিয়ান বললেন, ''মন্দির কমপ্লেক্সটা সত্যিই দেখার মতো! সাধারণ পর্যটকেরা ভাঙা মন্দির শুনলেই কথা ঘুরিয়ে শপিং সেন্টার খোঁজে। যাবেন মনে করলে বলবেন। গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব।'' ভদ্রমহিলার কথায় রাজি হওয়ার আগে হোটেলে থাকা অতিথিদের মন্তব্যগুলো দেখতে থাকলাম ইন্টারনেটে। মিসেস সেবাস্টিয়ান যে জায়গার কথা বলছেন, সেই জায়গা নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি। ম্যাপে দেখাচ্ছে, জায়গাটা ম্যাকলিয়ডগঞ্জ থেকে আশি কিলোমিটার দূরে। মানে ঘণ্টা আড়াইয়ের ধাক্কা। আসা-যাওয়ায় গোটা দিন ফুরিয়ে যাবে। তবু প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেওয়ার আগে ভাবলাম, জায়গাটা সম্পর্কে ইন্টারনেট কী বলছে দেখা যাক। জানতে পারলাম মন্দিরের নাম, 'মাসরুর টেম্পলস'।

বিপাশা নদীর কোলে, পাইন আর দেবদারু ঘেরা হিমাচলের কাংড়া উপত্যকায় মাসরুর একটা গ্রাম। উর্দু ভাষায় মাসরুর মানে 'আনন্দ'। আনুমানিক অষ্টম শতকের গোড়ায় কে বা কারা এই বিশাল মন্দির তৈরি করেছিল, কেউ জানে না।

পুরাতাত্ত্বিকেরা বলছেন, মাসরুর মন্দিরের স্থপতিরা মন্দিরের যে বিশাল বিস্তৃতি পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই কাজ অর্ধেক রূপায়িত হওয়ার আগেই কোনও অজ্ঞাত কারণে মন্দির তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিশেষজ্ঞরা একমত যে, পাহাড়চূড়া থেকে কাটতে কাটতেই এই মন্দির তৈরি

করতে চেয়েছিলেন শিল্পীরা। যাকে 'নাগারা' স্থাপত্যশৈলী বলা হয়ে থাকে। বিশাল বর্গক্ষেত্রাকার চত্বরের উপর গর্ভগৃহের মূল মন্দির ঘিরে অনেক দেব-দেবীর অধিষ্ঠান। দেওয়ালে সূক্ষ্ম কারুকার্য। ছাদে খোদাই করা পুরাণের শ্লোক। নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে মাসরুরের মন্দির নিঃসন্দেহে হিমালয়ের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হত।

অবশ্য মন্দিরের আকার নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে। হিন্দু প্রথায় মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার পূর্বমুখী। মাসরুরের ব্যতিক্রমী স্থপতি কেন মূল মন্দিরদ্বার উত্তর পূর্বে হিমালয়ের ধৌলাধার পর্বতমালার মুখোমুখি করেছিলেন, তার কোনও উত্তর নেই। ইন্টারনেট ঘেঁটে এত সব জানতে পারলাম। আরও জানতে পারলাম, মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থে, সাহিত্যে, এমনকি পরিব্রাজকদের লেখায় মাসরুরের মন্দিরের কোনও উল্লেখ নেই।

ভারতের মতো সংস্কৃতিমনস্ক সমাজে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

মাসরুর যেন বিস্ময়ের পর বিস্ময়! রহস্যের টানে ভারতের মন্দিরের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন এমন সংস্থা আর মিউজ়িয়ামের ওয়েবসাইটগুলো দেখতে দেখতে এক জায়গায় একটা ক্লু পাওয়া গেল।

ব্রিটিশ অফিসার হেনরি শাটলওয়ার্থ ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক। তাঁর ছিল ফটোগ্রাফির নেশা। ক্যামেরার প্রচলন তখন সবে শুরু হয়েছে। এক-একটা ক্যামেরা পাহাড়ে বয়ে নিয়ে যেতে দু'জন করে কুলি লাগত। শাটলওয়ার্থ প্রায় অর্ধেক জীবন পশ্চিম হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের ফটো তুলে সেখানকার জনজীবনকে মানুষের সামনে প্রথম তুলে ধরেন। এই শাটলওয়ার্থ ১৯১৩ সালে মাসরুর টেম্পলসের ফটো তুলে এনে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে জানালেন, মাসরুরের রক-কাট টেম্পল একটি হিন্দু বৈষ্ণব মন্দির। এবং ইউরোপীয় হিসেবে তিনিই এই মন্দিরের আবিষ্কারক। শাটলওয়ার্থের রিপোর্ট অনুযায়ী সার্ভে অফ ইন্ডিয়া মাসরুর মন্দিরকে সেই প্রথম একটি বিষ্ণু মন্দির হিসেবে নথিভুক্ত করল। সার্ভেয়ার হ্যারল্ড হারগ্রিভসকে মন্দির সার্ভের দায়িত্বও দেওয়া হল। এক টানা দু'বছর সার্ভের পর, ১৯১৫ সালে হারগ্রিভস তাঁর রিপোর্ট জমা দিলেন। লিখলেন, শাটলওয়ার্থের তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। মাসরুর কোনও বৈষ্ণব মন্দির নয়। গর্ভগৃহের একটি শিবলিঙ্গের স্কেচ দিয়ে দাবি করলেন, এটি আসলে শিবের মন্দির।

শুধু তা-ই নয়, হারগ্রিভস বললেন, ১৯১৩ সালে শাটলওয়ার্থ মন্দিরে পা রাখার আটত্রিশ বছর আগে ১৮৭৫ সালে এক ইউরোপীয় ড্রাফ্টসম্যান মাসরুর মন্দিরের সাইট-ম্যাপ স্কেচ করে এনেছিলেন। অর্থাৎ শাটলওয়ার্থ মাসরুর মন্দিরের আবিষ্কারক নন।

উত্তেজনায় রাত কাটল। সকাল হতেই স্কেচ-প্যাডটা ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লাম। ড্রাইভার শিবনাথজি মাসরুরের নাম শুনেই যেন চমকে গেল। ও দিকে সে কোনও দিন যায়নি। তার উপর পর্যটকরা যান না বলে চা-খাবারের দোকান মিলবে না জানা গেল। তবু রওনা দিলাম।

ম্যাকলিয়ডগঞ্জ থেকে নেমে ধরমশালা

মাসরুরের ভগ্নস্তূপ

সম্ভবত কার্তিকের মূর্তি

শহরকে বাইপাস করে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চলছে। রাতে ঠান্ডা, কিন্তু রোদের তেজ বেশ। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত যখন মাসরুর পৌঁছোলাম, বেলা দুপুর। চার পাশে তাকিয়ে মর্মাহত হলাম। রাস্তার ধারে একটা উঁচু পাহাড়। রুক্ষ পাথরের গায়ে শুধু বৃষ্টির দাগ। একেবারে মাথায় কয়েকটা পাথরের চাঁই উঁকি মারছে বটে কিন্তু, মন্দির কোথায়? ঠিক এসেছি তো? শুনশান রাস্তার ধারে এক জন গ্রাম্য মহিলার ছোট্ট দোকান। কয়েকটা ডিম, বিস্কুট আর লজেন্সের বয়াম। সসপ্যানে চায়ের জল ফুটছে। পায়ের কাছে একটা লোমশ কুকুর।

জিজ্ঞেস করতে বললেন, "এহি তো হ্যায় মাসরুর!"

শিবনাথজির ঠোঁটে 'বেশ হয়েছে' হাসি! আমার তখন রোখ চেপে গেছে। ব্যাকপ্যাক কাঁধে তুলে রাস্তা ধরে হাঁটা দিলাম। খানিক এগোতেই দেখি, আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের নীল সাইনবোর্ডে লেখা, 'মাসরুর টেম্পলস'। মনে হল, আমিও অভিযাত্রী! বোর্ডের গা দিয়ে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। সেটাই যে মন্দিরের প্রবেশ পথ, আন্দাজ করে কার সাধ্যি! উপরে উঠে যা দেখলাম, তার বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। দূরে হিমালয়ের সুবিস্তৃত ধৌলাধার পর্বতসারির চূড়ায় চূড়ায় বরফ। সামনে সুনীল আকাশের নীচে এক বিশাল পাথর-বাঁধানো দিঘিতে টলটলে জল। ঝাঁকে ঝাঁকে হিমালয়ান ট্রাউট দিঘিতে নিশ্চিন্তে খেলা করছে। দিঘির ও পারে সার সার গম্ভীর দেবদারুর ছায়া। আর আমার বাঁ দিকে এক বিশাল মন্দিরের অসংখ্য টুকরো ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। একটা কারুকার্য খচিত ক্ষতবিক্ষত স্তম্ভ দিঘির জলে কোমর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। পাথরগুলোর গায়ে অসংখ্য দেব-দেবীর অপরূপ মূর্তি, অপূর্ব কারুকার্য, প্রাচীন ভাষায় খোদিত পুরাণের শ্লোক। যেখানে মন্দির কিছুটা অক্ষত, সেখানে বিশাল পাথরের চাঁইয়ের বিপজ্জনক ফাঁক দিয়েই প্রবেশের উপায়। কিন্তু সব মিলিয়ে যা দেখছি, মনে হয় সেই বহু উচ্চারিত শব্দবন্ধই প্রযোজ্য, 'আহা কী দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।'

মন্দির চত্বরে কয়েক জন গ্রাম্য মানুষ রোদ পোয়াচ্ছিলেন। তাঁদের কাছে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য আশা করা যায় না। কাছাকাছি কোথাও থেকে বাচ্চাদের এক সুরে পড়ার আওয়াজ আসছিল। এ দিক-ও দিক ঘুরে দেখি, মন্দির চত্বরের এক পাশে গ্রামের প্রাইমারি স্কুল চলছে। ছাত্রদের আজ দিনটা ভাল। আধ ঘণ্টার ছুটি দিয়ে মাস্টারমশাই রঞ্জন দীক্ষিত আপ্যায়ন করে বসিয়ে জানালেন, "১৯০৫ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কাংড়া উপত্যকায় বিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। লাখ খানেক বাড়ি ধুলোয় মিশে যায়। তিপ্পান্ন হাজার গবাদি পশু পাথর চাপা পড়ে। পশু আর মানুষের পচা-গলা লাশের গন্ধ হিমালয়কেও বিষাক্ত করে তোলে। মন্দিরের যেটুকু বেঁচে আছে, সেটাও থাকত না যদি না এই মন্দির মনোলিথিক বা একই পাহাড় কেটে তৈরি হত। বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, মন্দিরের গর্ভগৃহে মোট নয়টি দেব-দেবীর অধিষ্ঠান ছিল। মধ্যমণি শিবের পাশে আরও আটটি মূর্তির মধ্যে বিষ্ণু, ইন্দ্র, গণেশ, কার্তিক এবং দুর্গা ছিলেন। মূল মন্দির ঘিরে অন্যান্য মন্দিরের লক্ষ্মী, সূর্য, সরস্বতী ছাড়াও বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের মূর্তির দেহাংশ এ-দিক ও-দিক ছড়িয়ে। অর্ধনারীশ্বর রূপে শিব-পার্বতীর মূর্তির খানিকটা দিঘির সামনেই পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া অসংখ্য নৃত্যরতা অপ্সরা এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রীর সুন্দর মূর্তিগুলোর কিছু কিছু অক্ষত," মাস্টারমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এখানে কেউ আসে না কারণ, এই মন্দিরে কাউকে দেখানোর মতো তো কিছু নেই! শুধু যার চোখ আছে, সে এর সৌন্দর্য দেখতে পায়।"

মাস্টারমশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিঘির পাড়ে ফিরে দেখি, গ্রামের মানুষগুলো চলে গেছে। বিশাল মন্দির চত্বরে আমি সম্পূর্ণ একা! পরিবেশের নিস্তব্ধতা দেবদারুর পাতায় পাতায় হিমেল হাওয়ার শিরশিরানিতে আরও গম্ভীর। দিঘির পাড়ে এক অপ্সরা মূর্তির ঘুঙুর পরা পা দু'খানি পড়ে ছিল। ওই পাথরে বসে একদৃষ্টে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্কেচবুকটা বের করে চটপট একটা পেন-স্কেচ করে উঠে দাঁড়াতেই মনে পড়ল, মাস্টারমশাই বলছিলেন, "গ্রামের মানুষ মন্দিরের শূন্য গর্ভগৃহে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার তিনটি মূর্তি বসিয়েছে। এখন তাঁরাই এই মন্দিরের পূজ্য দেব-দেবী। সে-ও কম করে পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল।"

ফটো: লেখক

দীপসুন্দর দিন্দা

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন 'দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স'-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

1 পরাধীন ভারতে নুপি লান বা নারী বিদ্রোহ কোন রাজ্যে হয়েছিল?

2 বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন, তিনশো কুড়ি বছর ধরে প্রকাশিত হওয়া সংবাদপত্র 'উইনার জ়াইতুং' সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেল, এটি কোন দেশের?

কাগজ

3 পুরুষদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে স্ম্যাশ করার নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন কোন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়?

4 মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত সিএনএস-এর পুরো কথা কী?

5 ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দিন এক টানা মুখ্যমন্ত্রী থাকার রেকর্ডে দ্বিতীয় নামটি কোন মুখ্যমন্ত্রীর?

6 ভারতে কার্গিল বিজয় দিবস পালন করা হয় কত তারিখে?

7 নর্থ চ্যানেল অতিক্রম করা কনিষ্ঠতম ভারতীয় সাঁতারুর নাম কী?

ব্যাডমিন্টন

সাঁতারু

8 তেনজ়িং ইয়াঙ্কি কোন রাজ্যের প্রথম মহিলা আইপিএস হলেন?

9 জিআই ট্যাগ-প্রাপ্ত নাগরী দুবরাজ চাল কোন রাজ্যের?

10 হুগলির জনাই-খ্যাত এই মিষ্টি। এটি খেয়ে জমিদার বলেন, 'তাঁর মন হরণ হয়েছে'। কী মিষ্টি?

২০ জুলাই সংখ্যার উত্তর

১। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২। চেন্নাই।
৩। ২৩ জুন।
৪। কর্নাটক।
৫। অ্যানাইহিলিন।
৬। পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। প্রদ্যোত ভট্টাচার্য।
৮। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।
৯। চোল সাম্রাজ্য।
১০। শিব।

সঠিক উত্তরদাতা

অন্বয় বেরা, *ষষ্ঠ শ্রেণি, কনুইবাঁকা উচ্চ বিদ্যালয়, ধনিয়াখালি।* **অঙ্কিত দাস,** *পঞ্চম শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, রিষড়া।* **অনীক নাথ,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর।* **রাজর্ষি সাহা,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম রহড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রহড়া।* **বিতান পোদ্দার,** *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।* **বৈশালী পোদ্দার,** *অষ্টম শ্রেণি, অগজ়িলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।* **সমৃদ্ধি সাহু,** *পঞ্চম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির (উঃ মাঃ), পশ্চিম মেদিনীপুর।* **অতসী মিত্র,** *অষ্টম শ্রেণি, সাউথ সাইড গার্লস হাই স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর।*

উত্তর পাঠাও ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে, anandamelamagazine@gmail.com এই ঠিকানায়।

পরশপাথর

মহুয়া সমাদ্দার

ঋক বলল, “এই পাবলো, মাঠ থেকে বেরিয়ে যা বলছি! তোর যা পায়ের জোর, যা কিকের ছিরি, তাতে করে যে টিম তোকে দলে নেবে তারা দশ-বিশটা গোল এমনিই খেয়ে বসবে। পালা এখান থেকে!”

ঋকের কথা শুনে মনের দুঃখে পাবলো পুকুর-পাড়ে এসে বসল। রায়পুর মাঠের পুব

দিকের এই পুকুরটা পাবলোর খুবই পছন্দের জায়গা। বর্ষাকালে এখানে সে ব্যাঙবাজি করে। শীতকালে এখানে বসেই ঝপ করে বেলা শেষ হয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসা, অন্ধকারকে একটু একটু করে কুয়াশার গিলে নেওয়া দ্যাখে। আর গ্রীষ্মে তেতে যাওয়া জলকে ধীরে ধীরে শীতল হয়ে যেতে দ্যাখে।

এ সব দেখতে দেখতেই সে জলের সঙ্গে কথা বলে। দু'-এক ফোঁটা চোখের জল নিজের অজান্তেই গাল বেয়ে নীচে নেমে আসে। এ সব দেখতে দেখতেই সে মা গঙ্গার কাছে জানতে চায়, কেন সে আর দশটা স্বাভাবিক ছেলের মতো জীবন পেল না? কেন তার ডান পা-টা বাঁ পায়ের চাইতে, স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই কমজোরি? ডান পায়ের সমস্যা তার জন্মগত। মা অনেক ডাক্তার-কবিরাজ করিয়েছে। যে যেখানে বলেছে, নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এই কারণেই জোরে হাঁটতে বা ছুটতে বেশ কষ্ট হয় তার। বল কিক করতে দারুণ অসুবিধেয় পড়তে হয় তাকে। এই কারণে পাড়ার সম বয়সি ছেলেদের দলে ভিড়তে পারে না সে। বেশির ভাগ দিন বিকেলে যখন অন্য সব ছেলে সারা মাঠ জুড়ে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করে, হুড়োহুড়ি করে, সে তখন একা একা পুকুর ধারে বসে মাছের হুটোপুটি আর বেলা ফুরিয়ে আসা দ্যাখে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই যে তার কাছে! আজও সেই নিয়মের অন্যথা হয়নি।

পুকুরের বাঁধানো সিঁড়ির ধাপে বসে পা দুটো জলের ভিতরে ডুবিয়ে নাচাচ্ছে একটু একটু। এর ফলে জলটাও নড়ছে তির তির করে। আর তার ডান দিক ঘেঁষে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট পাথর নিয়ে জলের দিকে ছুড়ে মারছে পুকুরের দিকে। হঠাৎ একটা পাথরে হাত দিতেই তার সারা শরীরে শিহরন ছড়িয়ে পড়ল। জলের দিকে তাকিয়ে ছিল বলেই বোধ হয় এত ক্ষণ খেয়াল করেনি। কিন্তু এ বারে পাথরের দিকে মুখ ফেরাতেই পাবলো দেখতে পেল, তার হাতে একটা অদ্ভুত ধরনের পাথর। পাথরটা মামুলি পাথরের চেয়ে বেশ আলাদা । গড়নও সাধারণ পাথরের মতো চ্যাপটা, গোল বা ডিমের মতো নয়। এই পাথরটা চৌকো ধরনের। রং নীলচে সবুজ। এই পাথরটাও সে জলেই ছুড়তে যাচ্ছিল। তার পর কী মনে হওয়ায় পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। মাঠে ছেলেদের খেলা শেষ হতেই ওরা যেই পুকুরে হাত-মুখ ধুতে আসতে শুরু করল, অমনি পাবলো জল থেকে পা তুলে হাওয়াই চটি গলিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

মাঠ থেকে বাড়ি ফিরেই জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলা পাবলোর মায়ের কড়া হুকুম। পাবলোর মাস ছয়েকের পুঁচকে ভাইয়ের জন্যেই পরিচ্ছন্নতার এই নিয়ম বোধ হয়। পাবলো প্যান্টটা মাটিতে ছুড়ে ফেলতেই টং করে একটা আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরের কথা মনে পড়ে গেল তার। সে পকেট থেকে পাথরটা বের করে তার ঘরের জানলার গ্রিলে থাকা দুটো টবের একটার উপর ছড়িয়ে রাখা ছোট ছোট পাথরের মধ্যে রেখে দিল। এই টব দুটোয় আগে ফুল ফুটত নিয়মিত। ভাইকে নিয়ে মা ব্যস্ত থাকছে বলে যত্নের অভাবে দুটো গাছই মারা গেছে বেশ কিছু দিন হল। ক্যাম্বিস বল ছুড়ে ছুড়ে দুটো টবকেই আধ-ভাঙা করে দিয়েছে পাবলো। টবের উপর পাথরটা রাখার পরেও বেশ কিছু ক্ষণ চেয়ে রইল সেটার দিকে। এমনিতে দেখলে আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে না। কিন্তু হাতে নিলেই কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে তার। কেন তা কে জানে!

সন্ধের খাবার খেয়ে পাবলো স্কুল ব্যাগ থেকে বই-খাতা বের করে বসল। রোজ সন্ধেবেলায় পড়তে বসার জন্য মায়ের সঙ্গে ঝামেলা হয় তার। সত্যি কথা বলতে কী, পড়াশোনা করতে একেবারেই ভাল লাগে না পাবলোর। এই জন্যেই মা জোরাজুরি করে পড়তে না-বসালে, কোনও দিনই নিজে থেকে পড়তে বসে না সে। কিন্তু আজ কী হল কে জানে! আজ তার পড়তে বসতে ইচ্ছে করছে। প্রথমেই অঙ্ক বইটা খুলে বসেছে সে। আজ স্কুলে অনুপস্যর দশমিকের অঙ্ক শিখিয়েছেন। গোটা পাঁচেক অঙ্ক হোমওয়ার্ক হিসেবেও দিয়েছেন। এর আগে মা হাজার চেষ্টা করেও তাকে দিয়ে অঙ্কের হোমওয়ার্ক করাতে পারেনি। পারবেই বা কী করে! অঙ্ক দেখলেই তো তার গায়ে জ্বর আসে। এত ভয়ানক বিষয় কেন যে তৈরি হতে গেল, তা কে জানে! কিন্তু আজ পাবলোকে ভূতে পেয়েছে বোধ হয়। সে অঙ্ক বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দশমিকের লেসনে এসে বেশ কিছু ক্ষণ ধরে উদাহরণগুলো দেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। তার পর মনে হল অকারণেই এত দিন ভয় পেয়েছে সে। অঙ্ক এমন কিছুই কঠিন বিষয় নয়। চেষ্টা করলে সে-ও পেরে যাবে ঠিক। অনুপস্যর তো সব সময়ই ওকে বলেন, "চেষ্টা, বুঝলি পাবলো, এক মাত্র চেষ্টা দ্বারাই ভয়কে জয় করতে পারে মানুষ।"

সে পেন দিয়ে খাতায় একটা-একটা করে অঙ্কের প্রশ্ন তুলতে লাগল। তার পর অনেক কসরত করে প্রথম অঙ্কটা শেষ করল। ঠিক সেই সময় মা অনুভা পাবলোর ছোট্ট ভাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পাবলোর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ পাবলোকে পড়ার টেবিলে বসে অঙ্ক কষতে দেখে যে সে কতটা অবাক হয়েছে, সেটা বোঝা গেল মিনিট খানেক পরেই।

বাবাকে ফোন করে মা বলছে, "আজ আর ক্লাবে যেয়ো না বুঝলে। অফিস থেকে সোজা বাড়িতে এসো। পাবলোটার মনে হচ্ছে শরীরটরির খারাপ হয়েছে।"

স্পিকার অন থাকায় পাবলো শুনতে পেল, ও পাশ থেকে বাবা বলছে, "কেন? কী হয়েছে ওর?"

কাঁপা কাঁপা গলায় মা বলছে, "যে ছেলেকে সন্ধেবেলা বই নিয়ে বসাতে গেলে গোটা পাড়ার লোক শুনতে পায়, সেই ছেলে কিনা আজ সন্ধে না হতেই অঙ্ক কষতে বসেছে! ভাবতে পারছ?"

এ বারে বাবার অট্টহাসি শোনা গেল, "উফ! অনু! তুমি পারোও বটে। এর জন্যে জরুরি তলব করছিলে! আর আমি ভাবলাম কী না কী। এই বছর ভাল করে সরস্বতী পুজো করো বরং। মা সরস্বতী এত দিনে তোমার ছেলের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন!"

পরের দিন স্কুলে গিয়ে আর-এক কাণ্ড। অনুপস্যর কোনও কারণে এমনিতেই খুব রেগে ছিলেন। ক্লাসে ঢুকেই ঘোষণা করলেন, "যারা যারা হোমওয়ার্ক করে আসিসনি, এ পাশে এসে কান ধরে দাঁড়িয়ে পড়।"

পল্টু, সিধু, মৃণাল-সহ বেশ কিছু ছেলে বিনা বাক্যব্যয়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা দাঁড়াতেই পাবলোর দিকে চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে স্যর বললেন, "কী

রে পাবলো? তুই বসে রইলি যে? আয় হতচ্ছাড়া! কান ধরে দাঁড়া।”

পাবলো অঙ্ক খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, “আমি তো হোমওয়ার্ক করে এনেছি স্যর!”

“হোমওয়ার্ক করে এনেছিস! বটে!” বলেই হ্যাঁচকা টানে পাবলোর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন খাতাটা। তার পর পাবলোর খাতায় সত্যি সত্যি অঙ্ক করা রয়েছে দেখে বার দুয়েক চশমা খুলে চোখ দুটো কচলে নিলেন। পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে যদিও তিনটেই ভুল হয়েছে, তবুও স্যর রেগে গেলেন না। বরং পাবলোর পিঠ চাপড়ে বললেন, “দেখলি তো হতভাগা! চেষ্টা করলে সবই হয়!”

বিকেলে মাঠে গিয়ে আর-এক কাণ্ড। পশ্চিম পাড়ার নীতিশের গত রাত থেকেই শরীর অসুস্থ হওয়ায় আজ সে আসতে পারেনি। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের টিমে পাবলোকে নিতে হল। পাবলো লজ্জায়, ভয়ে প্রথম দিকে নিজেকে গুটিয়ে রাখলেও একটু পর থেকেই তার মনে হতে লাগল, সুযোগ যখন পেয়েছি, চেষ্টা করে দেখি না কেন! সে সবটা মনের জোর এক করে চেষ্টা করল। খেলা শেষে দেখা গেল, পশ্চিম পাড়ার টিমের হয়ে একটা গোল দিতে পেরেছে সে। আর তার সঙ্গে বিপক্ষ দলের দু'-দুটো গোল ডিফেন্ড করতে সক্ষম হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, ডান পায়ে আজ আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না। ব্যথাও হচ্ছে না। তাজ্জব ব্যাপার! ডান পা-টা যে সবল হয়েছে, সেটা সে সকালে ঘুম থেকে উঠেই টের পেয়েছিল। এখন সেই টের পাওয়াটা সত্যি বলে মনে হল।

মাস খানেক সময় চলে গেছে। পাবলো এখন রোজ বিকেলেই মাঠে খেলতে যায়। খেলেও। ভাইয়ের সাত মাস বয়স হয়ে গেছে। রাতে সে সদ্য ঘুমোতে শুরু করেছে। এই কারণে মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য আগের তুলনায় বেশ ভাল। তা ছাড়া পড়াশোনা নিজে থেকেই পাবলো করে রাখছে বলে পাবলোর পিছনেও মাকে পড়ে থাকতে হয় না আর। স্কুলের কিছু কিছু ছেলে যারা পাবলোকে ছোট করে মজা পেত, তারা আর ততটা মজা করতে পারছে না। কারণ, পাবলো এখন পড়া করে স্কুলে যায়। দারুণ কিছু না-পারলেও আগের চাইতে অনেক ভাল পড়াশোনা করছে সে। পাবলোর আজকাল একটা কথা ভীষণ রকম মনে হচ্ছে। তার এই জীবন পরিবর্তনের জন্যে ওই পাথরটাই দায়ী। ঠাম্মা বলতেন, “পৃথিবীতে মাঝে মাঝে পরশপাথর খুঁজে পাওয়া যায়।”

তবে এটা কি সেই পরশপাথর? যার ছোঁয়া পেয়ে পাবলোর পা ঠিক হয়ে গেছে! যার ছোঁয়া পেয়ে তার পড়াশোনার প্রতি ভালবাসা জন্মেছে! মনে মনে পাবলো পাথরটার প্রতি ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাল। যদিও পা ঠিক হওয়ার জন্যে মা নতুন ডাক্তারবাবুর ওষুধকেই কারণ হিসেবে মনে করছে। কিন্তু পাবলো নিশ্চিত, এ সবই ওই পাথরটার কামাল।

> পশ্চিম পাড়ার নীতিশের গত রাত থেকেই শরীর অসুস্থ হওয়ায় আজ সে আসতে পারেনি। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের টিমে পাবলোকে নিতে হল। পাবলো লজ্জায়, ভয়ে প্রথম দিকে নিজেকে গুটিয়ে রাখলেও একটু পর থেকেই তার মনে হতে লাগল, সুযোগ যখন পেয়েছি, চেষ্টা করে দেখি না কেন! সে সবটা মনের জোর এক করে চেষ্টা করল।

সকালে পাড়ার রণেনবাবুর কাছে টিউশন পড়তে যায় পাবলো। আজও গেছে। ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে স্কুলের জন্যে তৈরি হতে যাবে, এমন সময় খেয়াল করল জানলা ফাঁকা। টব দুটো নেই। বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল তার। কোথায় গেল টব দুটো? ওই টবের মধ্যেই তো তার পরশপাথর ছিল! কী হবে এ বার!

“মা...! মা...!” চিৎকার করে উঠল পাবলো।

পাবলোর অত জোরে চিৎকারে সদ্য ঘুমন্ত ভাইয়ের ঘুম ভেঙে গিয়ে সে কাঁদতে শুরু করল। মা রান্নাঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

“কী হয়েছে পাবলো?” অমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন?

“মা, জানলায় রাখা টবগুলো কোথায়?”

“টব! ওহ! ওই ভাঙা টব দুটোর কথা বলছিস?”

“হ্যাঁ। কোথায় ও দুটো?”

“ক'দিন ধরেই ফেলব ফেলব করছিলাম। মনে থাকছিল না। আজ নোংরার গাড়ি আসতেই...”

“কী? ফেলে দিয়েছ?”

হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে পাবলো। মা হতবাক। এই পাগল ছেলেকে নিয়ে যে কী করে! দুটো ভাঙা টবের জন্যে কাঁদছে ছেলেটা!

কাঁদতে কাঁদতেই পাবলো বলল, “আর পাথরগুলো? ওগুলো কোথায় মা?”

“ধুর! ও সব পুরনো পাথর দিয়েই বা কী হবে? তোর বাবা বলেছে, সাহা স্টোর্স থেকে সুন্দর রঙিন পাথর এনে দেবে। নতুন টব কিনে ওই পাথর ছড়িয়ে দেব।”

“ওতে যে আমার পরশপাথর ছিল মা!”

“কী? পরশপাথর!” হেসে ফেলল অনুভা।

তখনই একটা মোটর ভ্যানের আওয়াজ আর একটা বাঁশির শব্দ কানে এল।

“নোংরার গাড়ি যাচ্ছে মা?”

“হ্যাঁ। সে রকমই তো মনে হচ্ছে!”

পাবলো এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। তার পর গাড়িটা যে দিকে যাচ্ছে, সে দিকে ছুটতে লাগল। গাড়িটাকে ধরতেই হবে তার। পরশপাথর ফেরত পেতেই হবে। বেশ কিছুটা ছুটে হাঁপাতে লাগল সে। বড় ক্লান্ত লাগছে। ডান পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, পাথরটা ছাড়াও তার পা সবলই রয়েছে। তখনই তার মন বলে উঠল, 'অন্য কোনও পাবলোর ব্যারাম সারাতে পরশপাথর সে দিক পানেই যাচ্ছে বোধ হয়!'

সে বাড়ির পথ ধরল। স্কুলে যেতে হবে তাকে। অনুপস্যর আজ অঙ্কের নতুন লেসন শুরু করবেন।

ছবি: সুমন পাল

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি

সমাদৃতা দত্ত

ষষ্ঠ শ্রেণি, সেন্ট জ়েভিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, পানিহাটি, কলকাতা।

আমার লেখা

অস্তাচলে ছেলেবেলা

কোথায় গেল লাটাই সুতো, কোথায় রঙিন ঘুড়ি
কথায় কথায় ভাব ও আড়ি, আমের আচার চুরি?
কোথায় গেল গুলিচামচ, চু-কিত-কিত খেলা,
বইয়ের পাতায় বন্দি আজই হতাশ ছেলেবেলা।

কোথায় গেল লালমাটি-পথ, কোথায় গেল নদী,
হারিয়ে যাওয়া সেই সব দিন পাই ফিরে ফের যদি,
স্মৃতির পাতা মাতায় আমার রঙিন স্বপ্নভেলা,
কেরিয়ারের কেরদানিতে খাবি খায় ছেলেবেলা।

স্কুলে পড়া, ঘরে পড়া, পড়া কোচিং ক্লাসে
আকাশ দেখার চোখ ঢেকে যায় প্লাস-মাইনাস গ্লাসে।
“আইনস্টাইন হতেই হবে, নয়কো অবহেলা”
বাবা-মায়ের হুঙ্কারে আজ কাঁদছে ছেলেবেলা।

সাগ্নিক মণ্ডল

অষ্টম শ্রেণি, গোপালনগর উচ্চ বিদ্যালয়, সিঙ্গুর, হুগলি।

আমার ছবি

তানিয়া সরকার

পঞ্চম শ্রেণি, বালুরঘাট গার্লস হাই স্কুল, দক্ষিণ দিনাজপুর।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও, anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায়।

ফর্দ

সমিত রায়চৌধুরী

খেলার মাঠের এক কোণে পুলক উপুড় হয়ে শুয়ে পেয়ারা খাচ্ছে। পাশেই দেবু বল ছাড়াই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বল করার প্র্যাকটিস করে চলছে। পুলক এক বার বাঁয়ে, আর এক বার ডানে কাত হতে হতে জিজ্ঞেস করল, "দেবু চল, প্রদীপকাকার বাড়ির পিছনের আম গাছ থেকে আম পেড়ে খাই। আজ দেখলাম

অনেক আম পেকে টুস টুস করছে। দেখলেই মনে হয় আমাদের ডাকছে।''

দেবুর তো আম শুনেই বোলিং অ্যাকশন বন্ধ। পুলকের দিকে তাকিয়ে বলল, ''চলো, আমিও ভাবছিলাম আম খাব।''

দুই বন্ধুর ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হল, তাই এখন স্কুল বন্ধ। স্কুলের মাঠেই দুপুরবেলায় দুই বন্ধু আয়েস করে সময় কাটাচ্ছে। পুলক একটু বয়সে বড়, কিন্তু দু'জনেই এক ক্লাসে পড়ে। দু'জনের খুবই বন্ধুত্ব। দেবুর সকল মুশকিল আসানের দায়িত্বও পুলকের। বন্ধু হলেও পুলকের কথা অমান্য করে না দেবু। তবু, দেবু এক বার জিজ্ঞেস করল, ''প্রদীপকাকা বাড়িতে থাকলে কী হবে? ধরা পড়ে যাব না তো? ওঁর মাও থাকতে পারেন, যদি আমার মাকে বলে দেন?''

সঙ্গে সঙ্গে পুলক বলল, ''এ সব কিছুই হবে না। আমি আছি না? আমরা বাড়ির পিছন দিক দিয়ে যাব। আর তা ছাড়া এই দুপুরে সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ টের পাবে না। শুধু শুধু ভয় পাবি না। চল!'' কথাগুলো বলতে বলতেই পুলক উঠে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে পিছনটা ঝেড়ে, সাইকেলে চেপে বলল, ''চল, উঠে পড়।''

একটু দূরেই প্রদীপকাকার বাড়ি। তাদের বাড়ির পিছনে পুরনো পরিত্যক্ত ডোবার উপর বিশাল আম গাছটা বেঁকে ডালপালা বিস্তার করে আছে। ডালগুলো থেকে সিঁদুর-রাঙা আম ঝুলে রয়েছে। যে কেউ দেখলে তার মুখে জল আসতে বাধ্য। প্রদীপকাকার ঘরের পিছনটা পুলক চুপচাপ এক বার দেখে এল। কাছে এসে দেবুকে বলল, ''সবাই ঘুমোচ্ছে রে। এই সুযোগ। চল! টপাটপ কয়েকটা পেড়ে নেই।''

পুলকের দেহটা একটু নাদুসনুদুস, ভারী, তাই সে গাছে ওঠার সাহস করল না। দেবুকে তুলে দিয়ে সে নিজে পাহারায় রইল। ছোটখাটো দেবু দ্রুত উঠে গেল গাছে। সাত-আটটা আম টপাটপ পেড়ে পুলককে চালান করে দিল।

হঠাৎ হল বিপত্তি। পুলকের ইশারায় দেবু যাচ্ছিল সবচেয়ে উঁচু ডালে ঝুলে থাকা হৃষ্টপুষ্ট একটা আম পাড়তে, কিন্তু ভারসাম্য রাখতে না পেরে ঝপাং শব্দ করে দেবু পড়ল কচুরিপানা ভর্তি ডোবার নোংরা জলে। সে এক বিকট আওয়াজ। একেই বলে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। সেই আওয়াজ শুনে প্রদীপকাকার বৃদ্ধা মা হাঁক দিলেন, ''কে রে ওইখানে?''

পুলক তা শুনে দিল দৌড়। দেবুর তখন অবস্থা খুবই খারাপ। জল থেকে সে উঠতে পারছে না। ডোবার কচুরিপানাভর্তি পচা জলে সারা শরীরটা ডুবিয়ে পাড়ের একটা ফেন কচু গাছের বিশাল পাতার আড়ালে মাথাটা লুকিয়ে রাখল। প্রদীপকাকার কোমরভাঙা বুড়ি মা-ও ছাড়ার পাত্র নন। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। আস্তে আস্তে ডোবার পাড় ধরে আসতে শুরু করলেন। আম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে যেন আমগুলোর হিসেব মেলানোর চেষ্টা চালালেন। দেবু বেচারার এ দিকে দম বেরোনোর উপক্রম। প্রায় অনেকটা সময় কেটে গেলে বুড়ি চলে যাওয়ার পর দেবু আস্তে আস্তে ডোবা থেকে উঠে বড় রাস্তায় আসতেই দেখে, পুলক সাইকেলে উঠে বসে আছে। মুখে তার তৃপ্তির হাসি।

''আজ তুই ভাল পারফরম্যান্স দেখালি দেবু!'' বীরের মতো বলল পুলক, ''চল মাঠে যাই। মাঠে গিয়ে আমগুলো সাবাড় করি। আমার তো আর তর সইছে না!'' বলেই পুলক ডান পায়ের প্যাডেলে দিল জোর চাপ।

গুরুর আদেশ পালন করার মতো বাধ্য হয়ে দেবু গিয়ে সাইকেলে চাপল।

দেবুর শরীর থেকে কচুরিপানা আর পচা জলের বাজে গন্ধ বেরোচ্ছিল। প্যান্ট-শার্ট সব ভেজা। কিন্তু তাদের আজকের সফলতার কাছে এ যেন তুচ্ছ। দুই বন্ধু মিলে খুব আরামসে চুপচাপ আমগুলো সাবাড় করতে শুরু করল।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল দেবু, ''সর্বনাশ হয়েছে, ভাই! আমি মহা বিপদে পড়লাম!''

তার দিকে তাকাল পুলক। দেখল দেবুর মুখ শুকনো, যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে তার মাথায়।

পুলক অবিচলিত, আবার চোখ বন্ধ করে একটা আমের আঁটির শেষ স্বাদটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''কী হল আবার? আমে পোকা নাকি?''

দেবুর মুখে কোনও শব্দ নেই। আমের দিকে এখন তার আর নজর নেই। শুধু প্যান্টের পকেটে কী যেন খুঁজছে অস্থির ভাবে।

দেবুর থেকে উত্তর না পেয়ে পুলক চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, ''কী হয়েছে বল। কী খুঁজছিস?''

দেবু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ''আজ আমি বাড়ি যেতে পারব না। আমার আজ বাজার করার কথা ছিল। সর্বনাশ হয়ে গেল। মা আমাকে আজ মেরে ফেলবে!''

দেবুর মায়ের কথা শুনে পুলক একটু নড়েচড়ে বসল। পাড়াসুদ্ধ সবাই চেনে জয়ন্তীদেবীকে। খুব কড়া প্রকৃতির মহিলা উনি। সকলেই ওঁকে একটু সমীহ করে চলেন।

পুলক জিজ্ঞেস করল, ''তুই কি বাজারের টাকাগুলো খুঁজছিস?''

দেবু বলল, ''না, মা টাকা দেয়নি। হারুর মুদির দোকানে বাকির খাতা আছে, সেখান থেকে বাজার করার কথা।''

পুলক বলল, ''তা হলে কী খুঁজছিস?''

দেবু বলল, ''ভাই, বাজারের ফর্দটা নেই, হারিয়ে গেছে।''

জয়ন্তীদেবী এমনিতে দেবুকে সব সময় বাড়ি থেকে বেরোতে দেন না। ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ায় ওকে একটু ছাড় দিয়ে রেখেছিলেন। এ বার পুলকও ভিতরে ভিতরে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ''সব সমস্যার সমাধান আছে। দেখা যাক কী হয়।''

দেবুর চোখে জল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, ''ফর্দটা যে কোথায় গেল! ওই ডোবার জলেই মনে হয়...'' তার পরই বলল, ''আমি গিয়ে ডোবায় খুঁজে দেখি!''

পুলক একটা ধমক দিয়ে বলল, ‘‘আরে ধুস! পাগল নাকি? ডোবায় কি আর পাওয়া যাবে? ক্রাইম করার পর ক্রাইম সিনে আর যেতে নেই। দাঁড়া। আমাকে একটু ভাবতে দে।’’

পুলকের আম খাওয়ায় বিরাম নেই। এ দিকে দেবুর তর সইছে না। পুলক চোখ বন্ধ করে আম খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী কী জিনিস কিনতে বলেছিল?’’

দেবু একটু ঘ্যান ঘ্যান করে বলে উঠল, ‘‘সে সব কি আমি মুখস্থ করেছিলাম? আমি তো ফর্দটা নিয়েই তোমার ডাকে বেরিয়ে পড়লাম।’’

পুলক ‘হুম’ বলে আবার চুপ।

‘‘ঠিক আছে। দেখা যাক, কী করতে পারি। তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি আসছি,’’ বলেই পুলক উঠে দাঁড়াল।

দেবু অসহায়ের মতো বলল, ‘‘আমি কী করব এখন?’’

‘‘অপেক্ষা!’’ বলে পুলক সাইকেলে চেপে রওনা দিল বড় রাস্তার দিকে।

দেবুদের বাড়িতে ঢুকেই জয়ন্তীদেবীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল পুলক, ‘‘কাকিমা, কেমন আছ?’’

জয়ন্তীদেবীর হাতে ঘর ঝাড় দেওয়ার ঝাঁটা, তা হাতে নিয়েই বললেন, ‘‘ভালই রে। তোরা কেমন আছিস? অনেক দিন দেখি না তোদের। মায়াদি কেমন আছে?’’

মায়াদেবী হচ্ছেন পুলকের মা। উপরে উপরে কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞেস করলেও এই পাড়ায় জয়ন্তীদেবী আর মায়াদেবীর মধ্যে সব সময় ‘আমেরিকা-রাশিয়া’ ধরনের ঠান্ডা লড়াই চলতে থাকে। দু’জনের মধ্যে সব সময় একটা টান টান প্রতিযোগিতা চলে। অনেকে না-বুঝলেও দু’জন দু’জনেরটা ঠিক ধরতে ও বুঝতে পারেন।

‘‘সবাই ভাল আছি,’’ বলে পুলক গিয়ে বারান্দায় বসল।

‘‘দেবু কোথায় রে? সেই সকালে বেরিয়েছে। বাজার থেকে জিনিস আনার কথা!’’ জয়ন্তীদেবী জিজ্ঞেস করলেন।

পুলক বলল, ‘‘ওকে দেখেছি বাজারের দিকে যাচ্ছে। চলে আসবে। আমিও বাজারের দিকে যাব। সাইকেলের চাকায় হাওয়া দিতে।’’

জয়ন্তীদেবী বললেন, ‘‘দেবুকে তাড়াতাড়ি আসতে বলবি। রান্নার দেরি হয়ে যাবে!’’

পুলক এই সুযোগটাই খুঁজছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ‘‘আজ কী কী রান্না হবে গো কাকিমা?’’

প্রশ্নটা শুনে জয়ন্তীদেবীর একটু খটকা লাগল। তৎক্ষণাৎ উত্তরটা না দিয়ে একটু চিন্তা করলেন। ভাবলেন, পুলককে কি মায়া পাঠিয়েছে? রান্নার খবর নিতে? মায়ার যা বুদ্ধি! নিশ্চয়ই এই সব খবর নেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছে। জয়ন্তীদেবী

পুলক এই সুযোগটাই খুঁজছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ‘‘আজ কী কী রান্না হবে গো কাকিমা?’’ প্রশ্নটা শুনে জয়ন্তীদেবীর একটু খটকা লাগল। তৎক্ষণাৎ উত্তরটা না দিয়ে একটু চিন্তা করলেন। ভাবলেন, পুলককে কি মায়া পাঠিয়েছে? রান্নার খবর নিতে? মায়ার যা বুদ্ধি। নিশ্চয়ই এই সব খবর নেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছে।

একটু সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে গুছিয়ে বলতে শুরু করলেন, ‘‘বুঝলি তো, আজ বাসন্তী পোলাও আর নবরত্ন পনির রান্না করব। তাই তো দেবুকে বাজারে পাঠিয়েছি।’’

রান্নার পদ শুনে পুলক বলে উঠল, ‘‘ফাটাফাটি রান্না হবে। পরে আসব আবার। আজ আসি তা হলে কাকিমা।’’

পুলক আর দেরি না-করে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা মাঠের দিকে চলল। সাইকেলটাকে দুরন্ত গতিতে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল দেবুর কাছে। দূর থেকে দেবুকে দেখেই ‘‘ইউরেকা, ইউরেকা! কেল্লা ফতে!’’ বলে চিৎকার করতে-করতে দেবুর কাছে পৌঁছোল।

দেবু যেন একটু স্বস্তি পেল। সে বুঝতে পারল পুলক তার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই বাজারের ফর্দটা খুঁজে পেয়েছে।

দেবু জিজ্ঞেস করল, ‘‘কোথায় পেলে ফর্দটা?’’

পুলক একটা ধমক দিয়ে বলল, ‘‘আরে ফর্দ লাগবে না! চল আমার সঙ্গে হারুর দোকানে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি,’’ দুই বন্ধু চলল হারুর দোকানে।

হারুর দোকানে গিয়ে পুলক বলল, ‘‘হারুকাকা, বাসন্তী পোলাও আর নবরত্ন পনির রান্না করতে যা যা লাগে তা দেবুকে দিয়ে দাও।’’

দেবুর দিকে তাকিয়ে পুলক চোখ টিপে বলল, ‘‘হয়ে গেল তোর ফর্দ। শুধু শুধু টেনশন করছিলি। তোর জন্য আমের মজাটাও ঠিক করে উপভোগ করা গেল না। কাকিমার কাছ থেকে সব জেনে এসেছি।’’

একটু স্বস্তি পেলেও নিজেকে দেবুর নিজেরই অপরাধী মনে হচ্ছিল, পুলককে এই অহেতুক কষ্টটা দেওয়ার জন্য।

হয়ে গেল বাজার। দেবু ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে উপস্থিত বাড়িতে।

জয়ন্তীদেবী কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর দেবু ব্যাগ থেকে একটা একটা জিনিস বের করে রাখছে। আজ ভাল খাবারের আনন্দ আর ভাল বাজার করার আনন্দে তার আত্মবিশ্বাসটা একটু বেশি। একে একে বাজারের থলে থেকে বেরিয়ে এল এক কৌটো পনির, কাজুবাদাম, কাঠবাদাম, পোস্ত, চারমগজ, গরম মশলা, গোবিন্দভোগ চাল, ঘি, কিশমিশ আরও কত কী। মাসের শেষে এই সব দেখে জয়ন্তীদেবীর যেন চোখ কপালে উঠল। মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে রাগে আগুন হয়ে ফেটে পড়লেন।

শুধু জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘এই সব কে বাজার করতে বলল?’’

দেবুর তো পিলে চমকে গেল। কী ভুল সে করল, বুঝতেই পারল না। জয়ন্তীদেবী বললেন, ‘‘ফর্দে তো লেখা ছিল আলু, ডিম, সয়াবিন আর মুসুর ডাল। এ সব আনতে কে বলল তোকে?’’

দেবু শুধু বলল, ‘‘পুলক যে বলল...’’

বাকি কথাটা সে আর বলতে পারেনি, কারণ, তার গালে তত ক্ষণে উড়ে এল বিরাশি সিক্কা ওজনের এক থাপ্পড়। আর বাকিটা ইতিহাস।

দার্শনিকেরা ঠিকই বলেন, ‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।’

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

১		২	■	■	৩	৪	৫
	■	৬	৭	৮	■	৯	
১০	১১	■	১২		১৩	■	
■	১৪	১৫		■	১৬	১৭	
১৮			■	১৯			■
	■	২০	২১		■	২২	২৩
২৪	২৫	■	২৬		২৭	■	
২৮			■	■	২৯		
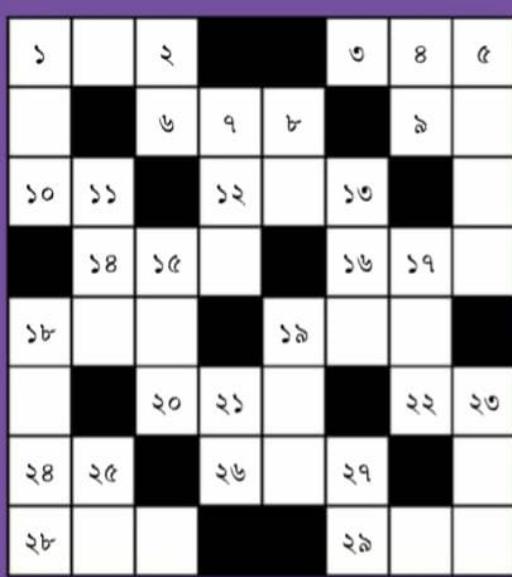
পাশাপাশি

১। হত্যা।
৩। মুখের সামনের কুঁচো চুল।
৬। টক জিনিস খেলে যেমন জিভে আওয়াজ করতে হয়।
৯। শক্তি।
১০। চিনির দ্রবণ।
১২। হারের ঠিক মধ্যিখানে থাকে।
১৪। বাসনা।
১৬। অনুকরণ।
১৮। জামার বিশেষ কারুকাজ।
১৯। সব।
২০। বশ করা।
২২। নতুন।
২৪। সমুদ্রের ধারের গাছ।
২৬। সমাদর।
২৮। মেয়ে।
২৯। ব্যবধান।

উপর-নীচ

১। অস্থায়ী দোকানদার।
২। নাটকের অভিনেতা।
৪। রাম ও সীতার এক সন্তান।
৫। নদী বয়ে চলার আওয়াজ।
৭। বর্ধমান জেলার একটি মন্দিরবহুল ঐতিহাসিক জনপদ।
৮। আগে ফ যোগ করলেই নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া।
১১। প্রত্যুষ।
১৩। হুঁশ।
১৫। জোয়ান পুরুষ।
১৭। গণনা। হিসেব।
১৮। ফুচকা, চিলি চিকেন যেমন স্বাদের হয়।
২১। শেষে র যোগ করলেই গঙ্গার বাহন।
২৩। পশমি বস্ত্রবিশেষ।
২৭। নিযুক্ত।

গত সংখ্যার সমাধান

হ	র	■	■	বি	লা	ব	ল
ন	■	চ	র	■	জ	■	য়
ন	র	ম	■	বা	■	ব	কা
■	ম	ক	ম	ক	■	ন	রি
স	র	■	ক	ল	র	ব	■
র	মা	■	র	■	জ	ন	ক
স	■	ও	■	ধা	ন	■	বী
র	স	গো	ল্লা	■	■	চা	র

শালুক

নিজের হাতে

কাগজের খরগোশ

উপকরণ: সাদা, কমলা, গোলাপি ও কালো অরিগ্যামি কাগজ, কাঁচি, কম্পাস, স্কেচপেন, আঠা।

কী ভাবে করবে:

১। প্রথমে কমলা কাগজটায় কম্পাস বসিয়ে কাঁচি দিয়ে ছবির আকারের একটা বড় গোল আঁকো।

২। এর পর সাদা কাগজটা নাও। তাতেও কম্পাস বসিয়ে কাঁচি দিয়ে একটা ছোট গোল আঁকো। এই গোলটা খরগোশের মাথা।

৩। বড় কমলা গোলের কাগজটা মাঝখান থেকে ভাঁজ করে নাও।

৪। এ বার খরগোশের পা আর চোখের জন্য ছবি দেখে দুটো সাদা বড় গোল, দুটো একটু ছোট আর দুটো কালো গোল কেটে নাও।

৫। খরগোশের কানের জন্য গোলাপি আর সাদা কাগজ থেকে দুটো করে অংশ কেটে নাও ছবি দেখে। গোলাপি একটা টুকরো কাটো নাকের জন্য।

৬। সব কাটাকুটি শেষ। এ বার ভাঁজ করা কমলা কাগজটার সামনে খরগোশের পা আটকে নাও। তার পর একে একে ছবি দেখে জুড়ে নাও। শেষে চোখ আর পায়ে স্কেচ পেন দিয়ে দাগ কেটে নাও। ব্যস, তৈরি কাগজের খরগোশ।

বৈশালী সরকার

কাগজের খরগোশ তৈরির উপকরণ

কাগজের খরগোশ

সেরা গল্প

সুব্রত নাগ

এই নিয়ে এগারো বার চিঠিটা পড়লেন সুধাময়বাবু। একত্রিশ বারও পড়া যেতে পারে এ চিঠি এমনকি, একাশি বার পড়লেও ক্ষতি কিছু নেই। কারণ, এই ধরনের চিঠি সাতচল্লিশ বছরের জীবনে এর আগে কোনও দিন পাননি সুধাময়বাবু। সত্যি বলতে কী, এই ধরনের একটা চিঠি পাওয়ার জন্যই তো এত দিন অপেক্ষা করে ছিলেন উনি। চিঠিটা ভাঁজ করে যত্ন করে তুলে রাখার আগে দ্বাদশ বারের মতো চোখ পাতলেন চিঠির বক্তব্যে—

প্রিয় সুধাময় সরকার, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের পত্রিকা দফতরে আপনার পাঠানো 'একটি ফুলের স্বপ্ন' গল্পটি মনোনীত হয়েছে। গল্পটি যথা সময়ে প্রকাশিত হবে। আপনি দয়া করে ইতিমধ্যে গল্পটি অন্যত্র প্রকাশের

জন্য পাঠাবেন না।

শুভেচ্ছান্তে
সম্পাদক,
ভোরের আলো পত্রিকা

ভাবা যায়! শিশু-কিশোরদের জন্য পয়লা নম্বর সাহিত্য পত্রিকায় অবশেষে তার গল্প ঠাঁই পেতে চলেছে! বারো বার চিঠিটা পড়ার ফাঁকে অন্তত বার তিনেক নিজেই নিজেকে চিমটি কেটেছেন। তিন বারই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করায় নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে স্বপ্ন নয়, বাস্তবেই ঘটেছে ব্যাপারটা। অমন যে ছিনে জোঁক রবার্ট ব্রুস, যিনি নাকি নবম প্রচেষ্টায় হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনিও নাছোড়বান্দা মনোভাবের বিচারে সুধাময়বাবুর কাছে দশ গোল খেয়ে যাবেন। 'শিশুজগৎ', 'স্বপ্নভেলা', 'খুশির মেলা', 'কাঁচামিঠে' ইত্যাদি ডজন খানেক ছোটদের পত্রিকায় কম সে কম খানচল্লিশ গল্প সুধাময়বাবু পাঠিয়েছেন। এই ভোরের আলো পত্রিকাতেই এর আগে না হোক গন্ডাদুয়েক গল্প পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাতে কী? প্রাপ্তির ঘরে ফক্কা। দিন কেটেছে, সপ্তাহ পেরিয়েছে, মাস গড়িয়েছে। চাতকের মতো বসে থেকেছেন, এই বুঝি কোনও পত্রিকা থেকে ভাল কোনও খবর এল! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। উপযাচক হয়ে যদি বা কোনও দফতরে ফোন করে জানতে চেয়েছেন, যথার্থ ভদ্রলোকের মতো সব জায়গাতেই এক রা শুনতে হয়েছে, "দুঃখিত, আপনার পাঠানো অমুক গল্পটি মনোনীত হয়নি।"

তা এটুকু বলেই থেমে যা, তা না, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেও ভুলত না কেউ, "ভবিষ্যতে আপনার ভাল গল্পের জন্য শুভেচ্ছা রইল।"

তেলে-বেগুনে আপাদমস্তক জ্বলে উঠতেন সুধাময়বাবু। ভবিষ্যতের ভাল গল্পের জন্য শুভেচ্ছা! মানে যে গল্পগুলো তিনি পাঠিয়েছিলেন সেগুলো ওঁচা! অপাঠ্য! কেন হে? শিশুজগৎ পত্রিকায় সেই যে মাস্টার ভূতের গল্পটা তিনি লিখেছিলেন, সেটা বুঝি খারাপ ছিল? তার পর ভোরের আলো-তেই ভিখিরির সঙ্গে জমিদারের ছেলের বন্ধুত্বের যে মর্মস্পর্শী গল্পটা পাঠিয়েছিলেন, সেটাও কি ছাপার যোগ্য ছিল না? এমনকি 'মাঠের কান্না' বলে যে গল্পটিকে তিনি তাঁর রচিত সেরা কিশোর রচনা বলে মনে করে থাকেন, সেটাও কিনা পাড়ার দুর্গা পুজোর সুভেনির সংখ্যা ছাড়া অন্য কোথাও ঠাঁই পেল না!

কিন্তু এত দিন মনোনীত না হওয়ার জন্য যে বিস্ময়টুকু জমা হয়েছিল, তার তিন গুণ বেশি বিস্ময় এই মুহূর্তে ফেনিয়ে উঠছে গল্পটা মনোনীত হওয়ার খবর পেয়ে। যত দূর মনে পড়ছে, মাস ছয়েক আগে পাঠিয়েছিলেন ভোরের আলো-র দফতরে। মাঠের এক কোণে আগাছার মধ্যে ফোটা একটি ফুলের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লিখেছিলেন গল্পটা। শেষটা এখনও দিব্যি মনে আছে, 'ধীরে ধীরে রোদের তাপ মুছে গেল। অন্ধকারের কালো কুটকুটে কম্বলে ঢেকে গেল চার দিক। বর্ষা কাল, তাই ব্যাঙের গ্যাঙর গ্যাঙ ডাক শোনা যেতে লাগল। রাতের ডিনার তাড়াতাড়ি সেরে ঘুমোতে গেল ফুলটা। কাল সকালে নতুন স্বপ্ন নিয়ে জেগে উঠতে হবে...'

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এক রকম অভ্যেসবশতই গল্পটা পাঠিয়েছিলেন। যাক গে, 'দের আয়ে দুরস্ত আয়ে' এই মন্ত্রেই বুক বেঁধে গল্পটাকে ছাপা অক্ষরে দেখার জন্য ছটফট করতে থাকলেন।

সব প্রতীক্ষাই এক দিন শেষ হয়। সুধাময়বাবুরও হল। ভোরের আলো-য় প্রকাশিত হল 'একটি ফুলের গল্প'। পত্রিকা দফতর থেকে ফোনে জানাতেই খবরের কাগজওয়ালাকে তিন দিন আগে থেকে তিন কপি পত্রিকার অর্ডার দিয়ে রাখেন সুধাময়বাবু। আগের রাতে এক ফোঁটাও ঘুম নেই চোখে, উত্তেজনায় বার বার উঠে বসেন বিছানায়, ঘড়ি দেখেন, জানলার পর্দা সরিয়ে লক্ষ করেন, অন্ধকার পাতলা হল কি না। ব্যাপারস্যাপার দেখে গিন্নি খেঁকিয়ে ওঠেন, "রাতভর ও রকম উসখুস করছ কেন? বায়ু চড়েছে নাকি?"

মিনমিনে গলায় সুধাময়বাবু বলেন, "না মানে, ভোর হল কিনা। পত্রিকাটা দিয়ে যাবে তো..."

কড়া গলায় গিন্নির দাবড়ানি খান সুধাময়বাবু, "পত্রিকা অফিসের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে মাঝরাত্তিরে এসে কাগজ ছুড়ে দিয়ে যাবে! শোও দেখি!"

গজগজ করতে করতে গিন্নি পাশ ফিরলেও বাকি রাতটা সুধাময়বাবু অন্য পাশে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকেন।

সকালবেলায় চা দিতে এসে স্বামীকে দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যান গিন্নি। সুধাময়বাবু একটা পত্রিকা হাতে উদাস চোখে বসে আছেন। কু গেয়ে ওঠে মনটা। জিজ্ঞেস করেন, "হ্যাঁ গো, ছাপেনি তোমার গল্প?"

শম্বুক গতিতে যে ভাবে মাথাটা নাড়েন সুধাময়বাবু, তার অর্থ পজ়িটিভ-নেগেটিভ দুটোই হয়। নিশ্চিত হতে না পেরে পত্রিকাটা টেনে নেন গিন্নি এবং সূচিপত্র অনুযায়ী আটত্রিশ পাতা বের করতেই নজরে পড়ে, একটি ফুলের স্বপ্ন— সুধাময় সরকার।

আশ্বস্ত হয়ে স্বামীকে বলেন, "তোমার গল্প তো বেরিয়েছে। তা হলে অমন উদোর মতো বসে আছ কেন?"

ফ্যাল ফ্যাল করে গিন্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাময়বাবু বলেন, "ওটা আমার গল্প নয়।"

"তোমার গল্প নয় মানে? দিব্যি তোমার নাম রয়েছে, গল্পের নাম রয়েছে, আর বলছ তোমার গল্প নয়?" গিন্নির গলার স্কেল চড়তে থাকে, "মাথাটা কি বিগড়েছে নাকি?"

গিন্নি দুপদাপ পা ফেলে চলে যাওয়ার পর আরও এক বার পত্রিকাটা তুলে আটত্রিশ পাতা বের করে রয়ে সয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সুধাময়বাবু। সত্যিই মাথাটা বিগড়ে যাওয়ারই কথা। ভোরের আলো পত্রিকায় তাঁর নামে যে গল্পটা ছাপা হয়েছে, তার মাত্র ছ'আনা তাঁর নিজের। বাকি বারো আনাই অন্য কারও লেখা! সম্পাদকীয় দফতর থেকে কি এতটাই এডিট করা হয়েছে? এ তো সেই আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের মতো হল ব্যাপারটা। স্কুলে পড়া ছেলে তপন গল্প লিখতে ভালবাসে। তার লেখক ছোট মেসোর বদান্যতায় সেই গল্প ছাপা অক্ষরে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ছাপা অক্ষরে নিজের নাম প্রথম দেখার আনন্দ তপনের মন থেকে কর্পূরের মতো উবে যায় যখন সে লক্ষ করে, লেখক ছোট মেসোর হস্তক্ষেপে সেই গল্পটি এতটাই বদলে গেছে যে নামটুকু ছাড়া তার নিজের বলতে আর কিছুই গল্পটায় অবশিষ্ট নেই। তার নিজের কেসটাও কি হুবহু সে রকমই নয়?

অস্বস্তিটা চাপতে না-পেরে বেলার দিকে পত্রিকার অফিসে ফোনই করে বসেন এবং জবাব শুনে অস্বস্তি কমার বদলে দশ গুণ বেড়ে যায়। দফতর থেকে পরিষ্কার জানানো হয়, গল্পটি যেহেতু তাদের খুব পছন্দ হয়েছে, তাই এডিট করার কোনও দরকারই তাঁদের পড়েনি। বিশেষত গল্পের

শেষাংশটুকু তাঁদের মতে, অতি চমৎকার হয়েছে। ফোনটা রেখে দু'নম্বর দীর্ঘশ্বাসটুকু ফেলেন সুধাময়বাবু। উচ্চ প্রশংসিত সেই 'অতি চমৎকার' শেষ অনুচ্ছেদের একটি বাক্যও তার নিজের নয়। তা হলে? এই অদ্ভুত রহস্যের তো একটা সমাধান হওয়া উচিত।

কিন্তু সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, দিনকে দিন রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে চলল। এক-একটা পত্রিকায় লেখা পাঠাচ্ছেন। কিছু দিনের মধ্যেই সেই পত্রিকা থেকে মনোনয়নের খবর পেয়ে যাচ্ছেন। পটাপট ছাপাও হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎই তাঁর লেখার ধার বেড়ে গেছে বলে যে, কলার তুলে ঘুরবেন, তারও জো নেই। প্রতি বারই ছাপার অক্ষরে তাঁর নামাঙ্কিত যে গল্পটা বেরোয়, তার বারো আনাই অন্য কারও লেখা। প্রতি বারই পত্রিকা অফিসে ফোন করে জেনেছেন, তাঁরা একটি লাইনও এ দিক-ও দিক করেননি। তা হলে? কেউ না-কেউ তো নিশ্চয়ই বদলাচ্ছে গল্পগুলো? এখন প্রথম কথা হচ্ছে, তাঁর এত বড় হিতৈষীটি কে? আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সেই লোক নিজেই যদি এত ভাল লেখে তা হলে নিজের নামে অন্য গল্প পাঠায় না কেন? ফেলুদার মতো মগজাস্ত্রে শান দিয়ে উত্তর দুটো খোঁজার চেষ্টা করেন সুধাময়, কিন্তু এখনও তিনি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।

রঘুর দোকানে সুধাময়বাবু ঢুকলেই রঘু বুঝতে পারে, আবার কোনও গল্প টাইপ করতে হবে। সাদা পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হস্তাক্ষরে গল্প লিখে ডাকে পাঠানোর প্রথা এখন অস্তাচলে। ছোট-বড় প্রায় সব পত্রিকাই চায়, লেখক যেন তাঁর গল্পটিকে কম্পিউটারে কম্পোজ় করে ওয়ার্ড ফাইলে ট্রান্সফার করে পত্রিকার মেল আইডি-তে পাঠায়। প্রাচীনপন্থী সুধাময়বাবু এ সব ব্যাপারে গভীর অজ্ঞ বলে পরিচিত রঘুই তাঁর প্রধান ভরসা। গল্প লেখা হলেই হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি রঘুর হাতে তুলে দিয়ে সুধাময়বাবু নিশ্চিন্ত। ডিটিপি করা, ওয়ার্ড ফাইলে বদলানো (প্রুফটা অবশ্য সুধাময়বাবু দেখে দেন), পত্রিকার মেল আইডি-তে পাঠানো— সবই শ্রীমান রঘুর দায়িত্ব।

আজকেও সুধাময়বাবুকে ঢুকতে দেখে রঘু এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করে, "আরে দাদা যে, আসুন, আসুন! নতুন কিছু নামালেন নাকি?"

সুধাময়বাবু লাজুক হেসে উত্তর দেন, "না ভাই, এ বার আর নতুন নয়, পুরনো। কলকাতার একটা পত্রিকা ছোটদের একটা গল্প সঙ্কলন বের করছে। তারা আমার একটা গল্প চাইছে। ভাবছি 'অদ্ভুত ভূত' গল্পটা পাঠাব কি না। এখন মুশকিল হয়েছে কী, গল্পটার কোনও কপি আমার কাছে পেলাম না। তুমি ভাই, গল্পটার একটা কপি আমাকে বের করে দাও। আমি কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেব।"

"পাঁচ মিনিট বসুন, বের করে দিচ্ছি," রঘু গল্পটা খুঁজতে খুঁজতে বলে, "অনেক গল্প তো বেরিয়ে গেল। এ বার নিজের একটা গল্প সঙ্কলন বের করুন।"

চাপা খুশি আর গর্ব-মেশানো একটা হাসি চলকে উঠল সুধাময়বাবুর মুখে, "অনেকেই তো বলাবলি করছে। দেখা যাক।"

গল্পের কপিটা বের করে সুধাময়বাবুর হাতে দিয়ে রঘু বলে, "একটা আবদার আছে দাদা। আপনার বই বেরোলে প্রথম কপিটা কিন্তু আমাকে দেবেন।"

"নিশ্চয়ই ভাই, নিশ্চয়ই", সুধাময়বাবু আশ্বস্ত করেন, "তোমার অধিকার তো সবার আগে।"

প্রায় মাসপাঁচেক পর শনিবারের এক সকালে সুধাময়বাবু এক বাক্স মিষ্টি আর গিফ্‌ট প্যাকে মোড়া একটি বই নিয়ে রঘুর দোকানে উপস্থিত হন।

"কী হল দাদা?" রঘু জিজ্ঞেস করে, "সকাল সকাল?"

রঘুর হাতে মিষ্টির প্যাকেট আর বইটা ধরিয়ে সুধাময়বাবু বলেন, "এই যে গল্পের বইটা বেরিয়েছে। তুমি বলেছিলে প্রথম কপি তোমাকে দিতে..."

"আপনি দাদা গ্রেট!" রঘু অবাক হয়ে বলে, "সত্যি সত্যি মনে রেখেছেন?"

গিফ্‌ট প্যাক ছিঁড়ে বইটা বের করতেই রঘুর হাসি হাসি মুখটা এক ঝলকে বদলে গেল। হাত দিয়ে দু'চোখ ভাল করে রগড়াল। তার পর এক বার বইয়ের মলাটের দিকে আর এক বার সুধাময়বাবুর দিকে তাকাতে লাগল। মুখ টিপে হাসছেন সুধাময়বাবু। এই ক্যাবলা ক্যাবলা হাঁ করা মুখের ছবিটা যে তিনি খুব ভাল করে চেনেন। পাঁচ মাস আগে যে দিন রঘুর কাছ থেকে অদ্ভুত ভূত গল্পের কপিটা নিয়ে এসেছিলেন, সে দিন বাড়ি ফিরে গল্পটায় এক বার চোখ বুলিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, সে দিন নিজের মুখে এ রকম অসহায়, ক্যাবলা একটা হাসিই দেখেছিলেন।

যে কপিটা রঘু কম্পিউটার থেকে বের করে দিয়েছিল তার সঙ্গে সুধাময়বাবুর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির বিশেষ মিল নেই। বরং হুবহু মিল আছে শিশুজগৎ পত্রিকায় ছাপা গল্পটার সঙ্গে! কুয়াশার জমাট পর্দাটা ছিঁড়ে যাওয়ার পর বিড় বিড় করেছিলেন, "রঘু! শেষে কিনা রঘু! ও-ই তা হলে গল্পগুলোর আগাপাশতলা বদলে পত্রিকাগুলোয় পাঠাত আর সেগুলো সুধাময়বাবুর নামে টপাটপ ছাপা হয়ে যেত! আচ্ছা, তিনি যে প্রুফ দেখে আসতেন, সেটাও তা হলে অর্থহীন! সবচেয়ে বড় কথা, রঘু এত ভাল গল্প লিখতে শিখল কোত্থেকে? আর ও যদি নিজেই এত ভাল লিখতে পারে, তা হলে নিজের নামে পত্রিকায় পাঠায় না কেন? নিছক কৃতজ্ঞতা! শুধু তা-ই? আর কিছু না! মাথার বেশ কয়েকটা চুল ছিঁড়েও সুধাময়বাবু সে দিন কোনও উত্তর খুঁজে পাননি।

আজ যেমন রঘু উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। পাবেই বা কী ভাবে? হাতে ধরা বইয়ের মলাটে যে লেখা রয়েছে, 'নির্বাচিত গল্প সঙ্কলন— লেখক শ্রী রাঘব মিত্র'।

ঘোর এখনও কাটেনি রঘুর। ফ্যালফেলে চোখে সে জিজ্ঞেস করে, "এ সব কী দাদা?"

"কিচ্ছু না! প্রথম কপি তো লেখককেই দিতে হয়," সুধাময়বাবু মৃদু হাসেন, "তোমার খেলাটা তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম শুধু।"

রঘু মলাটের উপর হাত বোলাতে থাকে। উল্টে-পাল্টে দেখতে থাকে বইটা, অদ্ভুত সব অনুভূতির আঁকিবুঁকি খেলা করতে থাকে রঘুর মুখে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রঘুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুধাময়বাবু উপলব্ধি করেন, পৃথিবীর সেরা গল্পগুলো খাতার পাতায় নয়, লেখা হয় মানুষের মুখের পাতায়। তেমনই একটি সেরা গল্প এই মুহূর্তে রঘুর মুখের পাতায় রচিত হচ্ছে! পাঠক হিসেবে সেই গল্পটা প্রথম পড়ার গভীর তৃপ্তিতে সুধাময়বাবুর মনটা ভরে ওঠে।

ছবি: সমরজিৎ রজক

সামনের বছরই কি আসতে চলেছে বয়স কমার ওষুধ?

বিশ্বে আসছে বয়স কমার ওষুধ

অবশেষে নাকি পৃথিবীতে আসতে চলেছে বয়স কমানোর ওষুধ। লিখেছেন **সুদেষ্ণা ঘোষ**

আমি বললাম, 'দুৎ! আমার বয়স হল আট বছর তিনমাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'
বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিগগেস করল, 'বাড়তি না কমতি?'
আমি বললাম, 'সে আবার কি?'
বুড়ো বলল, 'বলি বয়েসটা এখন বাড়ছে না কমছে?'
আমি বললাম, 'বয়েস আবার কমবে কি?'
বুড়ো বলল, 'তা নয় তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি? তাহলেই তো গেছি! কোনদিন দেখবো বয়স বাড়তে-বাড়চে একেবারে ষাট সত্তর আশি বছর পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি!'

আহা, বুড়ো হওয়ার দুঃখুটা এ বার বুঝি ঘুচল। সুকুমার রায়ের লেখা 'হ য ব র ল' বইয়ের সেই দিনটা মনে হয় এসেই গেল। কেননা হালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল বিজ্ঞানী বয়স কমানোর ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছেন! শুধু আবিষ্কারই নয়, এর কাজের মেয়াদও অবাক-করা। এক সপ্তাহেরও কম সময়ে এই ওষুধ কাজ করেছে। গত জুলাই মাসের মেডিকেল জার্নাল 'এজিং'-এ তাঁদের গবেষণার কথা প্রকাশ হওয়া মাত্রই হইচই পড়ে গিয়েছে দুনিয়ায়। গবেষক ডেভিড সিনক্লেয়ার বলেছেন, ''এর আগে আমরা বয়স কমানো দেখিয়েছিলাম জিন থেরাপি ব্যবহার করে। এখন কেমিক্যাল ককটেল ব্যবহার করেও যে তা সম্ভব, সেটি দেখাতে পারলাম।'' তিনি আরও বলেছেন, এটি আবিষ্কার করার জন্য টিমের সঙ্গে তিনি তিন বছরের বেশি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে কাজ করেছেন। ওষুধটি একাধারে সেলুলার এজিং-এর গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে, অন্য দিকে মানব-কোষকে তা তরুণতর করে তুলবে রেকর্ড সময়ে। তবে এই ওষুধসেবনে হ য ব রল-র বুড়ো শুধু নয়, সঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'কোগ্রামের মধু পণ্ডিত'ও হতে পারবে। মানে, শুধু বয়স কমানোই নয়, দীর্ঘ জীবন অটুট রাখতেও এটি পারঙ্গম। ওষুধটির প্রতিটি কেমিক্যাল ককটেলে পাঁচ থেকে সাতটি এজেন্ট আছে, যেগুলো গ্রহীতার অন্য শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করবে। অপটিক স্নায়ু, মস্তিষ্কের কলা, যকৃৎ এবং পেশির উপর আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। ইঁদুরের উপর গবেষণাগারের পরীক্ষায় গ্রোথ হরমোন, মেটফরমিন এবং একটি উৎসেচক বাড়ানোর ওষুধ এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। জরাগ্রস্ত পেশি, যকৃতের কলা এবং অন্যান্য অঙ্গে তারুণ্য ফিরিয়ে আনতে দারুণ কাজ দিয়েছে শুধু নয়, এই ওষুধ ব্যবহারের ফলে ইঁদুরের দৃষ্টিশক্তি এবং জীবনের মেয়াদও বেড়েছে। এ বছরের এপ্রিলে এটি বাঁদরেরও দৃষ্টি বাড়ানোর কাজ দিয়েছে। মি. সিনক্লেয়ার জানিয়েছেন, এই রিভার্সাল জিন থেরাপি নিয়ে মানুষের উপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কাজ জোরকদমে চলছে। সব কিছু ঠিক থাকলে পরের বছর মানুষের উপর পরীক্ষা হওয়ার কথা। কে বলতে পারে, সামনের বছরই সেই বুড়োটার মতো আমরাও মুচকি হেসে বলে উঠতে পারব, '*তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়েস ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ, বেয়াল্লিশ হয় না— উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল...*'

ফটো: আইস্টক

বাঘ ব্রহ্ম খেলা

রূপম ইসলাম

*(**আগে যা হয়েছে:** ব্রহ্ম ঠাকুরের তুলে দেওয়া রিভলভার নিয়ে খানিক ঘোরাফেরা করে তাঁর হাতেই আগ্নেয়াস্ত্রটি তুলে দিলেন জন চার্টওয়েল। তার পর তাঁদের মধ্যে এক রোমাঞ্চকর গুলি বিনিময় চলল। অবশ্যই কেউ হতাহত হল না। এর পর গল্পের পটভূমি হল কেমব্রিজ শহরের একটি বাড়ি। এখানেই নাকি এক সময় থাকতেন গায়ক সিড ব্যারেট। বাড়ির সামনে আড্ডা ও আলোচনায় রয়েছেন এরিক দত্ত, সিড ব্যারেটের নতুন দলের সহকর্মী জ্যাক স্পায়ার্স, বাড়ির বর্তমান মালিক অধ্যাপক রায়ান কার্টার এবং ম্যাথু হার্ডি নামে ওদের এক জন কমন ফ্রেন্ড। এই বাড়িরই চিলেকোঠার ঘর থেকে সিডের আঁকা চারটি পেন্টিং পাওয়া গেছে। এরিক তাঁদের বলতে শুরু করলেন, ব্রহ্ম ঠাকুর সিডের গান থেকে কী রহস্যের পাঠোদ্ধার করেছেন। কোনও ভিনগ্রহী যান কি পৃথিবীতে এসে আছড়ে পড়েছিল? আলোচনা এগোতে থাকে...*

এরিক এর পর আক্ষেপের সুরে বললেন, "তবে সিড কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল প্রসেসটা থেকে। সে প্রচণ্ড আশাহত হয়েছিল নিশ্চয়ই। ভিনগ্রহীদের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ সে সত্যিই করতে পেরেছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না। সে ব্যাপারটায় আগ্রহী ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানী তো আর ছিল না! কাজেই ওই সব বেতার যোগাযোগের ব্যাপার— যা সে

সাঙ্কেতিক ভাবে লিখেছে এবং স্পেস রক অ্যালবামের সাউন্ড ডিজ়াইনে রেকর্ডও করেছে ক্যাকোফনি ক্রিয়েট করে, কখনও উল্টো টেপ চালিয়ে, কখনও বা মুখবাদ্য করে, কখনও বা গিটার-সিন্থেসিসের সাহায্যে— ও সবই আসলে নিখাদ কল্পনা বা এলএসডি প্ররোচিত অন্যমাত্রিক বাস্তবতা। কিন্তু এ সবের পরেও সিড যে বিশেষ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল বলে আমার মনে হয়, তার পর তার অন্য দিকে আগ্রহ জন্ম নেয়। পড়াশোনা করে সে ব্যাপারে অনেক কিছুই সে জানতে পেরেছিল— এমনটা তার আঁকা ছবিগুলো দেখে আমার আজ মনে হচ্ছে। এ সব পড়াশোনা বস্তুতপক্ষে তাকে মহাকাশ গবেষণা থেকে প্রকৃতি প্রেমের দিকেই ঠেলে দিয়েছিল।

"অবশ্য যেটার কথা বলতে যাচ্ছি, সেই বিষয়টা নিয়ে সাধারণ আগ্রহ তেমন একটা সে যুগে ছিল না। মানে ছিল, কিন্তু 'ও তো হয়েই থাকে' এ রকম একটা ব্যাপারও ছিল— বিশেষত উত্তর গোলার্ধের এই অংশে 'তারা খসা' ব্যাপারটা খুব একটা অসাধারণ একেবারেই নয়। কিন্তু এখন এই ঘটনাগুলো নিয়ে নতুন করে নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে। আগে যা প্রাকৃতিক বলে বিবেচিত হচ্ছিল, এখন তার পিছনে এলিয়েন টেকনোলজি ক্রিয়াশীল বলে মনে করা হচ্ছে। আর এই সচেতনতার জন্য দায়ী হল এক নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যার নাম উমুয়ামুয়া!"

এরিক একটু থামতেই জ্যাক স্পায়ার্স বললেন, "এরিক, তুমি যা বলছ তার অর্ধেক বুঝছি, অর্ধেক না। কিন্তু একটা ব্যাপার একটু শুধরে দেওয়া যাক। সিডের এক বন্ধু ছিল, মিউজ়িশিয়ান সার্কলের বাইরে। সে ছিল হ্যাম রেডিয়ো স্পেশ্যালিস্ট। আমার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সিড-ই। তার সঙ্গেও সিড সময় কাটাত। তার নাম ছিল মিচ। মিচ বাওয়ার্স। তার রেডিয়ো তরঙ্গে ভিনগ্রহী কোনও সিগন্যাল ধরা পড়ে থাকলে আমি অন্তত অবাক হব না।"

"হ্যাম রেডিয়ো তো একান্তই অ্যামেচারদের পাসটাইম!

তবুও— এই মিচ বাওয়ার্স কোথায় থাকত? আশা করি সে বেঁচে আছে। এক বার যোগাযোগ করলে হয়...''

''বহু দিন যোগাযোগ নেই এরিক। কাল খোঁজাখুঁজি করে দেখব তা হলে। এ বার তুমি বলো, এই উমুয়ামুয়াটা কী বস্তু? শুনে তো আমার পিঙ্ক ফ্লয়েডেরই আর-একটা অ্যালবামের নাম মনে পড়ে যাচ্ছে 'উম্মাগাম্মা'!''

''ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমার আবার মনে পড়ছে ওদের প্রথম রেকর্ডের দ্বিতীয় পিঠের প্রথম গানটার কথা। 'ইন্টারস্টেলার ওভারড্রাইভ'! উমুয়ামুয়া হল সম্প্রতি আবিষ্কৃত এক ইন্টারস্টেলার অবজেক্ট, যা ঢুকে পড়েছিল আমাদের সৌরজগতে। নামটা হাওয়াইয়ান, কারণ হাওয়াই দ্বীপেরই এক মানমন্দিরে রাখা অতি উন্নত টেলিস্কোপে এটা ধরা পড়েছে। উমুয়ামুয়া মানে হল— 'দূর নক্ষত্রমুলুকের প্রথম অতিথি', অর্থাৎ এ প্রায় ইউএফও দর্শনের মতোই ব্যাপার। পার্থক্য হল, এখানে পথচলতি জনতা তাদের ক্যামেরায় হঠাৎ ফটো তুলছে না, এর সন্ধান দিচ্ছেন নাসায় কর্মরত মহাবিজ্ঞানীরা। প্রথম বার তাঁরা কনফার্ম করছেন, তাই তাঁরা 'প্রথম অতিথি' বলছেন। আমরা তো জানি এ জিনিস বহু যুগ ধরে চলছে।''

এত ক্ষণে মুখ খুললেন প্রোফেসর রায়ান কার্টার। তিনি বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন এরিক। সম্প্রতি এ রকম একটা আবিষ্কার হয়েছে বটে। কিন্তু সেটা তো প্রাকৃতিক ব্যাপার, প্রাযুক্তিক তো না। সবাই সেটাকে গ্রহাণুই বলেছেন! কেউ আবার বলছেন উল্কা।"

"রায়ান, বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই একটা চেনা ছন্দে যে-কোনও বিষয়কে মিলিয়ে দিতে পারলেই শান্তি পান। চিন্তা করে করে রাত জেগে কার কী লাভ বলুন তো? কেউ কেউ তবুও আলাদা হন। আমার বন্ধুস্থানীয় কসমোলজিস্ট অভী লোব প্রশ্নটা তুলে দিয়েছেন, নেপথ্যে আমারও ছোটখাটো ভূমিকা আছে। আমাদের বক্তব্য— গ্রহাণুর পরিচিত চেহারার সঙ্গে কম করে হলেও উমুয়ামুয়ার ছ'টা পার্থক্য আছে। আর আমি যা ফটো দেখেছি তাতে এটা স্পষ্ট যে, ওটা উল্কা নয়। উল্কা বাপের জন্মেও অতটা উজ্জ্বল ছিল না। আমাদের মনে হয়েছে ওটা নক্ষত্র পারের বুদ্ধিমানদের প্রেরিত কোনও যান বা যানের অংশ। হয়তো দুর্ঘটনায় সেই মহাকাশযান টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল। একটি টুকরো ঢুকে পড়েছিল আমাদের সৌরজগতে!''

খানিকটা অধৈর্য হয়েই জ্যাক স্পায়ার্স বললেন, "কিন্তু উমুয়ামুয়ার সঙ্গে সিড ব্যারেটের কী সম্পর্ক?"

এরিক বললেন, "উমুয়ামুয়ার ব্যাপারটাকে উল্টে নিলেই সম্পর্ক বোঝা যাবে। একটা স্পেসশিপকে যদি ধূমকেতু ভাবা যায়, একটা ধূমকেতু বা গ্রহাণুকেও তো খালি চোখে ইউএফও ভাবা যেতে পারে? আমার বিশ্বাস, সিড যে ঘটনাটা দেখেছিল, তা কোনও ইউএফও-র অবতরণ ছিল না। তা ছিল পৃথিবীর সঙ্গে এক গ্রহাণুর সংঘাত। সিডের আঁকা ছবিগুলো দেখে আমার সে রকমই মনে হচ্ছে। একটা ছবির ডান দিকে রয়েছে একটা সিলভারবিচ গাছ। অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায়। কিন্তু বাঁ দিকে এক আলোক-গোলক। এবং আলোক-গোলকটি যেন প্রায় মাটি স্পর্শ করে রয়েছে। অদ্ভুত ভাবে আর-একটা ছবি যেন এরই প্রতিলিপি। পুরোটাই এক, শুধু উজ্জ্বল গোলকটা এ বার ছবির ঠিক মাঝখানের জমি ছুঁয়ে। অন্য আর-একটা ছবি হল— হাতে মোমবাতি জ্বেলে হেঁটে যাচ্ছে এক কঙ্কাল। আমি যদি খুব ভুল না হই— এটা মেক্সিকোর একটা ফেস্টিভ্যালের প্রতীকী ছবি, 'ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য ডেড'। এই মৃতদের উৎসব স্মরণ করায় চিকসুলুবের সেই ভয়ঙ্কর আদিম উল্কাপাতকে— সেই উল্কাপাত, যার ফলে আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে শেষ হয়ে গেছিল ডায়নোসরেরা। আচ্ছা, এই ছবির এক পাশে এক বয়স্ক মানুষের চিন্তিত মুখের ছবি আছে, এই চিন্তিত ভঙ্গীমাটিও ভীষণ চেনা! বয়স্ক মানুষ এবং কঙ্কাল— এ কি জীবন-মৃত্যুর পারাপারের ইমেজারি নয়? এ বার শেষ ছবিটা। এটা মশাল হাতে সমুদ্রপারে এক ট্রাইবাল নাচের ছবি। এই নাচ কিন্তু সত্যিই জীবন-মৃত্যু চলাচলেরই সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন। অস্ট্রেলিয়া আর নিউ গিনির মধ্যবর্তী সমুদ্রে মার বলে এক দ্বীপ আছে। সেখানে নাকি প্রায়শই ধূমকেতুতে চড়ে মৃত পূর্বপুরুষ জীবিত রূপে ফিরে আসেন, বংশের নতুন মৃত ব্যক্তিকে অন্য পারে নিয়ে যেতে। আমি গেছি সেই দ্বীপে। সেখানে আমি ওদের গল্প শুনেছি। ওই দ্বীপের পুরনো অধিবাসীদের নাচ দেখেছি। সেই নাচ এই ছবিরই মতো। মশাল হাতে নাচা আদিম নৃত্য। সিড এ সব ছবি এঁকেছিল মানেই বোঝা যাচ্ছে, সে 'উল্কাপাত' বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করেছিল। ইউএফও থেকে ক্রমে তার মনোযোগ সরে এসেছিল উল্কাপাতের রহস্যের দিকেই।''

খানিকটা অধৈর্য হয়েই জ্যাক স্পায়ার্স বললেন, "কিন্তু উমুয়ামুয়ার সঙ্গে সিড ব্যারেটের কী সম্পর্ক?" এরিক বললেন, "উমুয়ামুয়ার ব্যাপারটাকে উল্টে নিলেই সম্পর্ক বোঝা যাবে। একটা স্পেসশিপকে যদি ধূমকেতু ভাবা যায়, একটা ধূমকেতু বা গ্রহাণুকেও তো খালি চোখে ইউএফও ভাবা যেতে পারে? আমার বিশ্বাস, সিড যে ঘটনাটা দেখেছিল, তা কোনও ইউএফও-র অবতরণ ছিল না। তা ছিল পৃথিবীর সঙ্গে এক গ্রহাণুর সংঘাত। সিডের আঁকা ছবিগুলো দেখে আমার সে রকমই মনে হচ্ছে।''

জ্যাক স্পায়ার্স বললেন, "ছবির ইঙ্গিত না হয় আমরা বুঝলাম। কিন্তু গানগুলো? গানগুলো রেকর্ড করার আগে সিড ছোট্ট ভূমিকা করে হাসতে হাসতে যেন মজা করে বা ঠাট্টা করে বলছে, 'পাস্ট ম্যান', 'প্রেজেন্ট ম্যান' আর 'ফিউচার ম্যান' নামের এই তিনটে গান সে রেকর্ড করে রেখে যাচ্ছে কোনও অনাগত ভবিষ্যৎ গবেষকের জন্য। যার খুঁজে পাওয়ার সে ঠিকই খুঁজে পাবে। স্টার্স নামের আমাদের ব্যান্ডের রিহার্সাল প্যাডে এত অগোছালো ভাবে স্পুলগুলো রাখা ছিল... জোর করে না খুঁজলে এগুলো পাওয়াই যেত না।''

''তুমি স্পুল প্লেয়ার এনেছ তো? চলো চলো, গানগুলো পর

পর শুনে ফেলা যাক। আমাকে খাতায়-কলমে একটু হিসেব নিকেশ করতে হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি একটা নোটপ্যাডে গানগুলোর ট্রানস্ক্রিপ্ট নিতে পারবে? আমার মনে হয় গানগুলোর মধ্যে থেকে একটা না-একটা বার্তা আমরা পাবই পাব। চলো চলো, শুভস্য শীঘ্রম।''

এ কথা বলে এক বার থমকে দাঁড়ালেন এরিক। পনিটেলটা খুলে নতুন করে বাঁধলেন। তার পর সল্ট অ্যান পেপার স্টাইলিশ চাপদাড়িটায় আনমনে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কী যেন উল্টে নিতে বললাম তখন? উমুয়ামুয়া না? আর-একটা জিনিসও কিন্তু উল্টেপাল্টে দেখতে হবে। সিডের আঁকা ছবিগুলো। ছবিগুলোর কোণ ছেঁড়া হওয়ার তো প্র্যাক্টিক্যালি কোনও কারণই নেই। যত্ন করে চারটেই গুটোনো ছিল। তা হলে কি কোণগুলোয় ছিল কোনও লুকোনো সঙ্কেত? কোণগুলো কি কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে? সেই সঙ্কেত কি এখন তবে অন্য কারও হাতে? প্রশ্ন অনেক। এগুলোর সমাধান চাই জলদি! প্রোফেসর কার্টার, যদি কিছু মনে না করেন, ছবিগুলোর ফ্রেম একটু খুলে ফেলা যায়?''

দুপুর গড়িয়ে সময়টা বিকেলের দিকে ধাবমান। যদিও সূর্য ডুবতে এখানে এখনও ঢের দেরি। চার জনই হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে গেলেন বাড়ির ভিতরে।

॥ ৯ ॥

এসেক্সের ম্যাচিং নামের গ্রামটার একদম প্রান্তসীমায় জন চার্টওয়েলের প্রাচীন প্যালেস। অন্তত দুশো বছর বয়স তো হবেই! দোতলা, ছড়ানো বাড়ি। চার দিকে বাগান বা লন আছে। পিছনের বাগান কিছু দূর পিছিয়ে জঙ্গলে মিশে গেছে। ম্যাচিং গ্রামটি এমনিতেই জনবিরল। এই বাড়িটা তারও একদম শেষ প্রান্তে হওয়ায় বাকি সামাজিকতা থেকে একদম বিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়। 'ভূতের বাড়ি' বলে অভিহিত করলে কেউই বিশেষ আপত্তি করবে না, বাড়িটা দেখে আশ্চর্যের এটাই প্রথম মনে হল। তবে মানুষ যে এখানে বসবাস করে, তার ছাপও আছে।

এখন বাড়িটার দোতলার ঘরগুলোয় আলো জ্বলছে। এক তলার সিড়ির ল্যান্ডিং ছাড়া কোথাও আলো জ্বলছে না। মনে হয় না নীচের তলাটা খুব একটা ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে পরে জন জানিয়েছিলেন, "বাড়ির বেশির ভাগ অব্যবহৃত অংশই মেরামত করা হবে বলে ঠিক করা আছে। কাজ শুরু হবে কিছু দিন পরে।"

বাড়িটায় ওরা এসে পৌঁছোল বিকেলে। দিনের আলো অবশিষ্ট থাকবে আরও ঘণ্টা তিন-সাড়ে তিন। জন চার্টওয়েলের বাড়িতে কাজের লোক বা বাটলার এক জন রয়েছেন। বয়স্ক, ভারিক্কি মেজাজের মানুষ। মনে হল, পুরনো আমলের লোক। আর এক জন হয়তো রান্নাবান্নার দায়িত্ব সামলান। ভিতর-বাড়িতে আর কেউ আছেন বলে জানা গেল না। তবে নিস্তব্ধতা ঠিকই সাক্ষী দিচ্ছে— বাড়িতে খুব বেশি লোকের ভিড় নেই।

অবশ্য ঢোকার ঠিক মুখে একটা পেল্লায় গেট আর খোঁচা খোঁচা ইট বসানো দেওয়ালের গায়ে সাদা পাথরের নামফলক দেখে এসেছে আশ্চর্যরা, সেখানে মজুত ছিলেন একজন দ্বাররক্ষী। শ্বেতপাথরের ফলকে খোদাই করা আছে বাড়িটার নাম— 'নিউম্যান্‌স এন্ড'। পুরো বাড়ি এবং বাগান উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, খালি পিছনের বাগান যেখানে জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে, সেখানে কোনও দেওয়াল নেই।

লাল কার্পেটে মোড়া প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির দেওয়ালে টাঙানো আছে হরিণের স্টাফ করা মাথা। চিতা বাঘের মাথাও রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই পড়ে একটা বেশ বড় ড্রয়িংরুম। ড্রয়িংরুমের আসবাব বাড়ির সঙ্গে মানানসই— প্রাচীনগন্ধী এবং অভিজাত। একটা বেশ বড় ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। দেওয়ালগুলোয় আরও নানা পশুর মাথা, বাঘছাল ইত্যাদি লাগিয়ে রাখা হয়েছে, যেমন থাকার কথা শিকারির বাড়িতে। ড্রয়িংরুম পেরিয়ে আর-একটু সামনে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে লম্বা টেবিল রাখা এক বিশাল ডাইনিং হল। ডাইনিং হলের জানলাগুলো দিয়ে বাড়ির সামনের অংশটা দেখা যাচ্ছে। জানলাগুলো লম্বা, মাটি পর্যন্ত। জানলার উপরে প্রথম ব্র্যাকেটের মতো অর্ধবৃত্তাকার আর্ক আছে, জানলাগুলোর পাশ দিয়ে লম্বা পর্দা মাটিতে এসে ঠেকেছে। ড্রয়িংরুমের বাঁ দিকে একটা ঘর। জন জানালেন, সেটা জনের শোবার ঘর। ডান দিকে লম্বা করিডোর। কার্পেটে মোড়া করিডোর পেরিয়ে বেশ অনেকটা হেঁটে গেলে একদম শেষ মাথার ডান হাতে পড়ছে গেস্টরুম। এখানেই থাকবেন ব্রহ্ম ঠাকুর এবং আশ্চর্য।

জন নিজেই ওদের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। ঘরটা বেশ বড়, ছিমছাম। এখানেও দুটো স্টাফ করা পশুর মাথা আছে— একটা হরিণ। একটা ভল্লুক। জন বললেন, এগুলো তাঁর পূর্বপুরুষদেরই শিকার করা। এই বাড়ির পুরনো মালিক এগুলোকে বিদায় করেননি। তিনি নিশ্চয়ই এগুলোকে এ বাড়ির অবিচ্ছেদ্য সৌন্দর্য মনে করেই এগুলোর সংরক্ষণ করেছেন। এই ঘরের জানলাটা পিছনের বাগানের দিকে মুখ করা। পুরনো আমলের বাড়ি, তাই অ্যাটাচড বাথরুম নয়, রুমের দরজা দিয়ে বাইরে বেরোলে বাঁ হাতেই পড়বে আলাদা বাথরুমের দরজা। বাথরুমের পরেও করিডোরে আর-একটা ঘর আছে। সেই ঘরটার দরজা বন্ধ। সেখানে কেউ আছে কি না আপাতত জানা যাচ্ছে না। ওটা স্টোররুমও হতে পারে।

লন্ডনেই জনের গাড়িটা রাখা ছিল। পুরনো একটা কালো রঙের বুইক। নিজেই গাড়িটা চালিয়ে লন্ডন থেকে ওদের দু'জনকে নিয়ে এসেছেন জন চার্টওয়েল। ওদের নিয়ে এ বাড়িতে ঢোকার পর তাঁর হাবভাব যেন একটু বদলেই গেছে। বিষয়টা চোখ এড়ায়নি ওদের দু'জনেরই। সাহেবের আচরণ এখন একটু শিথিল, একটু যেন 'মাই ডিয়ার' ভাব রয়েছে তাঁর অতিথি আপ্যায়নে।

ব্রহ্ম ঠাকুর অবশ্য গম্ভীর। কী যেন ভাবছেন তিনি। তাঁর মুখে একটা ভারিক্কি পাইপ। পাইপটায় গাড়িতে বসেই তামাক ঠুসেছিলেন তিনি। মাঝে মাঝেই ওটা নিভে যাচ্ছে, তখন আবার দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে নিচ্ছেন ব্রহ্ম। এই পাইপটাই কি নেড়েচেড়ে দেখছিলেন সে দিন ড্রয়ার থেকে বের করে? হতেও পারে। তবে ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বে এটা একটা নতুন জমজমাট সংযোজন, এটা মানতেই হবে। ইংল্যান্ডে নেমেই তাঁর অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যাবে— এটা আগাম ভেবেই তিনি পাইপটা নিয়ে এসেছেন। ইংল্যান্ডে প্রবাসকালে নিয়মিত পাইপ খেতেন। এখানকার সারা বছরের মেঘলা মন-কেমন আবহাওয়ায় তাঁর পাইপের সঙ্গটা নাকি বিশেষ করে দরকার হয়!

(ক্রমশ)

ছবি: রৌদ্র মিত্র

বরাহনগর রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল (গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড)

কলকাতার উত্তর শহরতলির এই স্কুলটি ছাত্রীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় বহু দিন ধরেই রত।

সে আজকের কথা নয়। কলকাতার উত্তর শহরতলিতে সমাজসেবক শ্রী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ১৮৬৫ সালের ১৯ মার্চ এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ইংরেজ-শাসনে বাংলা কাঁপছে। শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, তিনকড়ি মৈত্র, কানাইলাল ঢোল, পঞ্চানন নিয়োগী, ড. কানাইলাল পাল প্রমুখের অকুণ্ঠ অবদান ও সহযোগিতায় এই বিদ্যালয়ের পথচলা শুরু। আজ সার্ধশতবর্ষ পেরিয়ে একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলকাতায় বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে এটি। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অনুমোদন পায়। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রাজকুমারী দেবী ছিলেন স্কুলের অন্তরাত্মা। শশিমুখী ভাদুড়ী প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করে ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহ-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় স্কুলটিকে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তার পরে করুণা ভট্টাচার্য, শিবানী চট্টোপাধ্যায়, কুমকুম সেনগুপ্ত এবং বর্তমানে প্রধান শিক্ষিকা পায়েল দে দত্ত স্কুল ও ছাত্রীদের উন্নতি সাধনে ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাধনায় সদা-সক্রিয় রয়েছেন। ছাত্রীরা যাতে প্রকৃত মানুষ হয় ও সাফল্যের সঙ্গে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে, সে দিকে সর্বদা নজর রেখে চলেছেন প্রধান শিক্ষিকা, তাঁর সহশিক্ষিকারা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। প্রাতঃ বিভাগে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এবং দিবা বিভাগে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলটিতে পঠনপাঠন হয়। বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা চোদ্দোশো। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে পড়ার সুযোগ রয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। স্মার্ট ক্লাসরুম, ছোটখাটো অনুষ্ঠানের জন্য ছাত্রীদের হাতে সাজানো হল, ছাত্রীদের হাতে আঁকা ছবিতে স্কুলবাড়ি সুসজ্জিত। স্কুলের একটি বড় মাঠ আছে, যা বর্তমানে শহরের বুকে দুর্লভ। আছে মাঠ ঘিরে অনেক পুরনো বিশাল গাছ। ঢোকার পথের দু'ধারেরসাজানো বাগানও ভারী দৃষ্টিনন্দন। স্কুলের লাইব্রেরিটি অতি সমৃদ্ধ। অনেক দুর্লভ পুরনো বইয়ে ঠাসা। সব রকম পরিকাঠামো সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, পুষ্টিবিদ্যা, ভূগোল এবং কম্পিউটার ল্যাবরেটরি আছে। ছাত্রীরা এখানে শিক্ষিকাদের কাছে হাতে-কলমে কাজ করার সব রকম সহায়তা ও প্রশিক্ষণ পায়।

প্রধান শিক্ষিকা পায়েল দে দত্ত

বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, বনহুগলি, সিঁথি ইত্যাদি অঞ্চল থেকে ছাত্রীরা এখানে পড়তে আসে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতি বছর স্কুলের রেজ়াল্ট অত্যন্ত ভাল হয়। অতীতে দু'টি বড় পরীক্ষাতেই ছাত্রীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। সেই ঐতিহ্য মেনেই ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিকে যোজনগন্ধা দাস রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আবার স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে।

স্কুলে বনমহোৎসব, রবীন্দ্রজয়ন্তী, শিক্ষক দিবস, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবেই হয়। এ ছাড়াও স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজি জয়ন্তী এবং স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিবস পালিত

গত বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা

স্কুলবাড়ি

নির্মল ভারত পুরস্কার-হাতে ছাত্রীরা

বিভিন্ন সরকারি চাকরির প্রস্তুতির জন্য প্রতি শনিবার স্কুলে ক্লাস হয়। ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পড়ুয়াদের জন্য কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন হয়ে থাকে। ইংরেজিতে ভয় কাটানোর জন্য 'স্পেলবি' সংস্থার আয়োজনে ছাত্রীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ ছাড়া ছাত্রীরা নিয়মিত ইকো-ক্লাবের দায়িত্ব নেয়। স্কুলপ্রাঙ্গণ এবং ক্লাসরুমের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখে। স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষিকাদের সম্পর্ক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। মন খুলে নানা বিষয়ে আলোচনা তো করেই পড়ুয়ারা এবং সব কাজে শিক্ষিকাদের নির্দেশ মতো উৎসাহের সঙ্গে কাজও করে। শিক্ষিকাদের কাছেই তারা স্কুলকে ভালবাসতে শিখেছে। এ ব্যাপারে সার্বিক পরিবেশ তাদের সাহায্য করেছে। স্কুলে সৌরশক্তির মাধ্যমে আলো, পাখা চালানোর জন্য সোলার প্যানেল বসানোর কাজ চলছে। ছাত্রীদের জন্য পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সঙ্গে ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিড-ডে মিল বিতরণের সুব্যবস্থা আছে। ছাত্রীদের সাইকেল রাখার নির্দিষ্ট জায়গা আছে স্কুলে। নানা ভাবে ছাত্রী ও বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেড়শো বছরের পুরনো এই স্কুল। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে উজ্জ্বল বরানগর

শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে আনন্দিত ছাত্রীরা

হয়। ছাত্রীদের মিলিত উদ্যোগে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রতি বছর স্কুলপ্রাঙ্গণে সরস্বতী পুজো হয়। ছাত্রীরা অঙ্কন, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ় তথা হাতের লেখায় আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ও পুরস্কৃত হয়। এই বছর নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার পেয়েছে স্কুলটি। নির্মল বিদ্যালয় অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ছাত্রীরা রাজ্য স্তরে পুরস্কৃতও হয়েছে। কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে ছাত্রীরা সুন্দর একটি প্রদর্শনী আয়োজন করেছিল। লেখাপড়ার সঙ্গে নানা বিষয়ে ছাত্রীদের আগ্রহ ও সাফল্য লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর অকাদেমির উদ্যোগে এক নাট্যশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ছাত্রীরা আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করেছে।

প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। বিদ্যালয়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ক্যারাটে, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্যাডমিন্টন ও তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ছাত্রীরা রাজ্য স্তরে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছে। এ ছাড়াও অনেক ছাত্রী নিয়মিত জিমন্যাস্টিক্স অনুশীলন করে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি এখানে স্পোকেন ইংলিশ, নাচ এবং কম্পিউটার শেখানো হয়। আইএসআই-তে মাল্টিমিডিয়া ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়ে ছাত্রীরা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে এবং কম্পিউটার শিক্ষিকা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা

রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল উত্তর শহরতলির এক স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ও থাকবেও, আশা করাই যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

রেডি-স্টেডি-গো ডিগবাজি (পর্ব-৯)
কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষপুর বাজার
আমি সন্তোষপুর বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। কিডন্যাপ করার সবচেয়ে উপযুক্ত লোক ছোট বাপি! হ্যাঁ!
ওর কাছেই নিয়ে যাব। একটাই মুশকিল ব্যাটা ভাল হতে চাইছে। দেখি, কী করা যায়!
এদের পুরো দলটা বদের ধাড়ি। এই লোকটা দেখি শেষ পর্যন্ত কোথায় যায়?
আর যাই হোক তোমার মতো রাস্তায় ভিক্ষে করতে বেরোয়নি। হিহি!
ব্যাটা কোথায় যে যাচ্ছে...
পুতুলটা বাড়ি নিয়ে যাব। ভাইকে দিয়ে দেব। এদের তো এত খেলনা!

Please subscribe
আপনারা কোনও কাজের নয়। অপদার্থ! একটা বাচ্চাকে কিডন্যাপ করতে বলছি, পারছেন না।
যাক, পুতুলটা হাতাতে পেরেছি।
ছেলেটি দেখলাম বিশেষ কিছু বলল না। আমি ভাবছিলাম কাঁদতে শুরু করবে।
দেখুন ম্যাডাম! অপদার্থ-টার্থ বলবেন না বলে দিচ্ছি! এ সব কাজ সাবধানে করতে হয়। অ্যাডভান্স দিয়ে মাথা কিনে নেননি!
এক সপ্তাহের মধ্যে কাজটা করুন। আর না হলে টাকা ফেরত দিন।
'জিভে গজা' কোনও দিন কোনও কাজে ফেল করেনি। হয়ে যাবে!

'পুতুল' নিয়ে মেয়েটি বাড়িতে পৌঁছোল...

মেয়েটার ব্যাগে করে মেয়েটার বাড়ি যাচ্ছি। আমার মন বলছে এখানে কিছু ঘটবে।
কিন্তু কী ঘটবে? দেখা যাক। সাইকেলের স্পিড কমছে, তার মানে বাড়ি চলে এসেছে।
দিদি, আজকেও কাজের বাড়ি থেকে আলু-পিঁয়াজ ঝেড়ে এনেছিস?
নিজের জন্য থোড়াই আনি? তোর জন্যে একটা পুতুল এনেছি। অদ্ভুত দেখতে।
বটে! দেখি।
কই রে বাবা। কত ছোট পুতুল! এ তো শুধু আলু আর পিঁয়াজ!
আমাকে ভোলানোর জন্য মিথ্যে কথা বলছিস?

(ক্রমশ)

মাগেন ডেভিড সিনাগগের অপূর্ব অভ্যন্তর

মাগেন ডেভিড সিনাগগ

কলকাতায় ইহুদিদের সুপ্রাচীন উপাসনালয় নিয়ে লিখেছেন **সুদেষ্ণা ঘোষ**

কলকাতার ব্রেবোর্ন রোড এবং ক্যানিং স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ঐতিহ্য আর ইতিহাসকে বুকে নিয়ে রসিক দর্শনার্থীদের জন্য কবে থেকে অপেক্ষা করছে মাগেন ডেভিড সিনাগগ। কলকাতায় ইহুদি যোগ বলতেই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে নাহুমের কেকের কথা... এই উপাসনালয়ে গেলে সেটি পাল্টে যেতে পারে। ১৮৮৪ সালে ইলিয়াস ডেভিড এজরা তাঁর পিতা ডেভিড জোসেফ এজরার স্মরণে তৈরি করেছিলেন সিনাগগটি— শহরের পাঁচটি সিনাগগের অন্যতম যেটি। ভারত তো বটেই, এমন সুন্দর সিনাগগ সমগ্র দেশেই হয়তো দুর্লভ। সকাল ন'টা থেকে রাত আটটার মধ্যে যে-কোনও সময় এখানে ঘুরে দেখা যায়। কী দেখবে? ঢোকার প্রবেশপথটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ফুটপাতের রাশি রাশি দোকানে ঢাকা পড়ে গেছে। তবু খুঁজে নিয়ে ঢোকার সময় চোখে পড়বেই ষড়ভুজাকার 'স্টার অফ ডেভিড' (মাগেন ডেভিড) এবং হিব্রু লিপির ফলক, দুই পাশের দেওয়ালে কলকাতার ইহুদিদের জন্য উৎসর্গীকৃত স্মারকফলক। দৈর্ঘ্যে ১৪০ ফুট এবং চওড়ায় ৮২ ফুট, ইটালিয়ান রেনেসাঁস শৈলীর সিনাগগে ঢুকে মনে হতে পারে, মধ্য যুগের ইউরোপে পৌঁছে গিয়েছ। সাদা-কালো খোপ কাটা মার্বেলের মেঝে, রাজকীয় ঝাড়বাতি, রঙিন কাচের জানলা... বাইরের হট্টগোল যেন জাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বহু পুরনো এক সময় নিবিড় শান্তি আর প্রার্থনা নিয়ে অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। উঁচু জানলা আর ছাদে লাগানো বহু রঙের কাচের টুকরো থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে এক আশ্চর্য স্বপ্নের ঝিলমিল। বিরাট হলের মাঝখানে মঞ্চের মতো উঁচু জায়গা। এখানে রাবাই অর্থাৎ ইহুদি পুরোহিতরা প্রার্থনা করতেন। হলের শেষ প্রান্তে গ্যালারির মতো এক জায়গা সুদৃশ্য কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ভিতরে রক্ষিত রয়েছে ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ 'তোরা'। মাঝের দরজার উপর রয়েছে ইহুদি ধর্মের প্রতীক মেনোরা বা ছয় শাখাযুক্ত বাতিদান আর মাগেন ডেভিড। ছ'টি মুখের তারা মাগেন ডেভিড বোঝায় ঈশ্বর পূর্ব, পশ্চিম উত্তর, দক্ষিণ, উপর এবং নীচ— এই ছয় দিক দিয়েই ভক্তকে রক্ষা করেন। মাগেন ডেভিডের কম্পাউন্ডের ভিতরে নেভেহ সালোমে নামে আর একটি সিনাগগও আছে। দু'টিই পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অধীনে। এক সময় পাঁচ হাজারেরও বেশি ইহুদি ছিলেন কলকাতায়। এখন হয়তো কুড়ির আশপাশে। তাঁরা আজও কেউ কেউ এই সিনাগগে আসেন। তখন মোম জ্বলে ওঠে। প্রার্থনা ও পবিত্রতায় মন্দ্র হয়ে ওঠে লাল ইটে তৈরি দেড়শো বছরের পুরনো উপাসনালয়।

বাইরে থেকে সিনাগগটি

ফটো: উইকিমিডিয়া কমন্স

কুড়ি হাতের প্রাণী

সেই প্রাণী (ফটো: টুইটার)

দক্ষিণ (আন্টার্কটিক) মহাসাগরের গভীরে থাকে কিম্ভূত কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণী। ২০০৮-২০১৭ সাল দক্ষিণ মহাসাগরে অনুসন্ধান চালিয়ে 'আন্টার্কটিক সি ফেদার' নামে এক বড়সড় অমেরুদণ্ডী প্রাণীর একটি নতুন প্রজাতি খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি তাঁরা জানিয়েছেন, নতুন এই প্রজাতিকে তাঁরা ডাকছেন, 'আন্টার্কটিক স্ট্রবেরি ফেদার স্টার' নামে। অদ্ভুতুড়ে এই প্রাণীর দেহের গড়ন স্ট্রবেরির মতো আর শরীরে হাত-পায়ের সংখ্যা কুড়িটি!

রাশিয়ার পাল্টা চন্দ্রাভিযান

লুনা-২৫-এর উৎক্ষেপণ

এক মাসেরও বেশি লম্বা সফর শেষ করে ভারতের চন্দ্রযান-৩-এর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করার কথা ২৩ অগস্ট। চন্দ্রযান-৩ রওনা দেওয়ার প্রায় ১ মাস পর রওনা দিয়েছে রাশিয়ার চন্দ্রযান, লুনা-২৫। তাঁদের ইচ্ছে, ২১ অগস্ট একই ঠিকানায় পৌঁছোনোর। রাশিয়া শেষ বার চাঁদে যান পাঠিয়েছিল সাতচল্লিশ বছর আগে। চাঁদের অচেনা দক্ষিণ মেরুতে জল থাকতে পারে। সে কারণেই সেখানে পৌঁছোতে সকলের এত তাড়াহুড়ো।

নতুন আইন, নতুন নাম

সংসদ ভবন

ভারতীয় দণ্ডবিধির (ইন্ডিয়ান পেনাল কোড) নতুন নাম হচ্ছে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'। ফৌজদারি দণ্ডবিধির (ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোড) নাম হচ্ছে 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা'। ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টের নাম হতে চলেছে 'ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম'। ব্রিটিশ আমলে প্রচলিত, শতাব্দী-প্রাচীন এই আইনগুলোয় অদলবদল এনে সরকার চাইছে যুগোপযোগী আইন আনতে। প্রস্তাবিত নতুন আইনে 'গণপিটুনির ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড'-এর মতো নানা নতুন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

হাওয়াইয়ে দাবানল

আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মাউই কাউন্টির লাহাইনা শহরে ক'দিন আগে ছড়িয়েছিল দাবানল। হ্যারিকেন ডোরার প্রশ্রয়ে সেই দাবানল এমন ভয়াবহ আকার নিল যে, প্রাণ গেল শতাধিক মানুষের। গত একশো বছরে কোনও দাবানলেই এত বেশি সংখ্যায় প্রাণ হারাননি আমেরিকানরা। মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, অভূতপূর্ব এই বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশাসনও কার্যত দিশেহারা।

মাউই-তে দাবানল
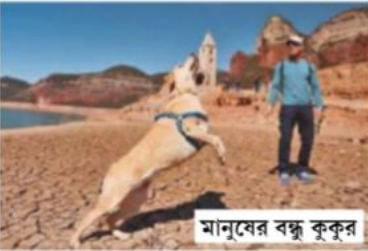
আন্তর্জাতিক সারমেয় দিবস

মানুষের বন্ধু কুকুর

মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু কুকুর। আদিম মানুষকে সে শিকারে সাহায্য করত। আধুনিক মানুষকে ওরা দেয় নিরাপত্তা। অনেকে বলেন, কুকুরের সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, এমন পরম সুহৃদ প্রাণীর আয়ু মাত্র বছর পনেরো। স্বল্পায়ু এই জীবনেও ওরা যে ভাবে আপদে-বিপদে-আনন্দে মানুষকে সঙ্গ দেয়, তার প্রতিদানে মানুষ আর কিছু করুক না-করুক, অগস্টের ২৬ তারিখ পৃথিবী জুড়ে পালন করে আন্তর্জাতিক সারমেয় দিবস। এ বছর এই দিনে আশপাশের কোনও সারমেয়র সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব করবে নাকি?

জাতীয় ক্রীড়া দিবস

হকি খেলছে পড়ুয়ারা

১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬। পর পর তিনটে অলিম্পিক্স থেকে ভারতকে সোনা এনে দিয়েছিলেন 'হকির জাদুকর' মেজর ধ্যানচাঁদ। তাঁর আসল নাম ছিল ধ্যান সিংহ। কিন্তু রাত্রিবেলা চাঁদের আলোয় খেলাধুলো করতেন বলে সবাই তাঁকে ডাকত 'ধ্যানচাঁদ' নামে। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মানও তাঁর নামেই, 'মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার'। ১৯৫৬ সালে তিনি পেয়েছিলেন পদ্মভূষণ পুরস্কার। এ হেন কিংবদন্তিকে সম্মান জানিয়ে আমাদের জাতীয় ক্রীড়া দিবসও পালিত হয় তাঁর জন্ম-তারিখেই। প্রতি বছর ২৯ অগস্ট।

নারকেল

বিশ্ব নারকেল দিবস

নারকেলের শাঁস। তার ভিতরের জল। তার গায়ের ছিবড়ে খোসা। তার ফলের শক্ত খোলা। মানুষের কাজে লাগে নারকেলের প্রায় সর্বস্ব। খাদ্য ও পানীয় হিসেবেও এই ফলের গুণ ঈর্ষণীয়। নারকেলকে পছন্দ করেন না, এমন লোক তাই খুঁজে পাওয়া শক্ত। তাদেরই উদ্যোগে আজ অনেক বছর হল সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ পালিত হচ্ছে বিশ্ব নারকেল দিবস। এত দিন এই দিবসটাকে তেমন পাত্তা না দিলেও চলত, কিন্তু সম্প্রতি জলবায়ুর পরিবর্তন এবং সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে নারকেলও পড়েছে সঙ্কটে। এই সঙ্কট থেকে তাকে বাঁচানোর উপায় আমাদের বিশেষ ভাবে খোঁজা দরকার এই ২ সেপ্টেম্বরে।

মোবাইল ছেড়ে মাঠের দিকে

তিতির ভাল মেয়ে এ তো সবাই জানে। কিন্তু গেনু যে কারও কথা শোনে না, এও কি কারও জানতে বাকি আছে? সে স্মার্টফোনে মুখ গুঁজে প্রায় দিনভর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। তিতিরও যে মোবাইল ঘাঁটে না, তা নয়। কিন্তু সে তো বুঝদার। দিনে খানিকটা সময় মোবাইলের পিছনে দিলে অসুবিধে হয় না। গেনুকে বোঝাবে কে?

এমনিতে কাজের ক্ষতি অর্থাৎ পড়াশোনার ক্ষতি তো হয়ই। এখন দেখতে হবে, স্মার্টফোন দেখার প্রত্যক্ষ শারীরিক কুফলগুলো। ডাক্তারেরা বলছেন, দীর্ঘ সময় ধরে যাঁরা ঝুঁকে স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের মতো যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাঁদের মুখে খুব শীঘ্র বলিরেখা দেখা দেয়। এ ছাড়া ঝুঁকে মোবাইল ফোন ব্যবহারে ঘাড় ও কাঁধে ব্যথা হয়। এ ছাড়া চামড়ার উপর মাধ্যাকর্ষণ চাপ বাড়ায় চামড়া কুঁচকে যাওয়া, দুই চিবুক, চিবুক ও ঠোঁট বরাবর খাড়া লাইন ও চোয়াল আলগা হয়ে পড়ে। 'স্মার্টফোন ফেস' কথাটা এখন চিকিৎসার পরিভাষায় চলে এসেছে। এর অর্থ, অতি মাত্রায় ফোন ব্যবহারের ফলে মানুষের মুখে যে অকাল বার্ধক্যের ছাপ পড়ে। এর পর আছে, খেলাধুলো না-করার জন্য মোটা হয়ে গেলে অল্প বয়সেই উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা। তখন কিন্তু পছন্দের প্রায় সব খাওয়াই বন্ধ হবে। এ ছাড়া রেডিয়েশন-জনিত ক্ষতি তো আছেই। কানের কাছে ফোন থাকায় কান এবং মস্তিষ্কের অঞ্চলে অ্যান্টি-ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন চিকিৎসকরা। শিশুদের মস্তিষ্কের হাড়, কলা এবং প্রতিরক্ষামূলক আবরণগুলো খুব পাতলা। এই অঙ্গগুলো মোবাইল ফোনের ৬০% রেডিয়েশন শোষণ করে। বিকিরণটি সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রকেও প্রভাবিত করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটি ক্যান্সারের সম্ভাব্য কারণ বলে ঘোষণাই করেছে। এর চেয়ে ভাল নয় কি, বিকেল হতেই খোলা আকাশের তলায় গিয়ে ছোটাছুটি, ব্যাট-বল পেটানো, খাতার পাতায় রঙিন ছবি ফুটিয়ে তোলা, বন্ধুর সঙ্গে দেদার আড্ডা মারা? তোমরা যারা গেনুর মতো মোবাইলে সারা ক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকো, দুটো বিকল্পের মধ্যে তুলনা করে দেখো কিন্তু।

আমার বই

কলকাতার প্রথম

কলকাতার প্রথম বাংলা নাট্যশালা, প্রথম ইংরেজি স্কুল, প্রথম মেয়েদের স্কুল, প্রথম মেলা, প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র... এগুলোর নাম হয়তো সবাই আমরা জানি। কিন্তু সত্যিই কি? কতটা জানি? একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার পিছনে কতটা সংগ্রাম, কতটা দীর্ঘশ্বাস, কতটা সুখ-দুঃখের গল্প জড়িয়ে থাকে, সেগুলো কিছুটা অন্তত না-জানলে জানাটা নিছক একটা তথ্য হয়ে থেকে যায়। এই বই সেই ফাঁক বা খামতি থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে তোমায়। ইতিহাস আর গল্প, এই দুই বিষয়ই যে মিলেমিশে লীন হয়ে আছে এই বইয়ে, যা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একটা কারণ অবশ্যই এই সব্যসাচী লেখকের হাতের ছোঁয়া, যাঁর নাম পূর্ণেন্দু পত্রী। আঁকা ও লেখা, দুই শাখাতেই তিনি প্রচুর বিস্ময় রেখে গেছেন ভাবীকালের জন্য। ছোটদের জন্য অপূর্ব এক মৌখিক ভাষায় কলকাতা নিয়ে একাধিক অসামান্য বই লিখেছেন। তারই অন্যতম আলোচ্য বইটি। এমনই সে ভাষার মাধুর্য আর সারল্য, বলে বোঝানোর চেয়ে একটুখানি উদ্ধৃত করে শোনাই—*কেরীর ছাপাখানাটাও ছিল অদ্ভুত। এখনকার মতো লোহা-লক্কড়ে তৈরি নয়। কাঠের। বন্ধু জর্জ উডনি-র উপহার। নৌকোয় চেপে সে ছাপাখানা যেদিন মনদবাটীতে এসে পৌঁচেছিল, গ্রামের মানুষ-জন দেখে বিস্ময়ে হতবাক। তারা ঐ ছাপাখানার নাম দিয়েছিল 'সাহেবদের ঠাকুর'।* আর একটা জায়গা শোনো... এখানটা ভারী মজার। *তখন হাইকোর্টের যিনি বিচারপতি, তাঁর নাম সীটন কার। ঠাকুরবাড়িতে তিনি এসে বসেছেন সেদিনের 'নব নাটক' অভিনয়ের দর্শকদের চেয়ারে। নাটক দেখতে দেখতে কনসার্ট শুনে জুড়িয়ে যাচ্ছে কান। কী অপূর্ব! নাটক শেষ হতেই কনসার্ট-ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, কনসার্টে কী কী যন্ত্র বাজানো হয়েছিল নিজের চোখে দেখে নিতে। ঘরে ঢুকেই লজ্জায় জিভ কেটে 'বেগ ইয়োর পার্ডন, জেনানা জেনানা' বলে বেরিয়ে এলেন তিনি। আসলে সে ঘরে জেনানা অর্থাৎ মহিলা বলতে হাজির ছিলেন না কেউই। ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ...জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গে তখন মেয়েদের সাজগোজ। 'নব নাটকে' তাঁর চরিত্র ছিল 'নটী'র।* এই রকম ভারী আটপৌরে জলের মতো ভাষায় ইতিহাসকে গল্পের মায়ায় বাঁধা এখানে। যা পড়তে পড়তে তোমরা তন্ময় তো হবেই, এ ছাড়া উপরি হিসেবে আশ্চর্য সব অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি গল্প বলে তাক লাগিয়ে দিতে পারো বন্ধু থেকে গুরুজন, সবাইকেই। তাতে তোমার কলারটাও উঁচু হবে বইকি!

সুদেষ্ণা ঘোষ

দ্রুত পাক দিচ্ছে মঙ্গল

মঙ্গল গ্রহে এক দিন হয় চব্বিশ ঘণ্টা সাঁইত্রিশ মিনিটে। মঙ্গলের এই এক দিনকে আমরা বলে থাকি ‘সল’। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা হিসেব করে জানতে পেরেছেন, খুব অল্প হলেও (বছরে মাত্র ০.৭৬ মিলিসেকেন্ড) প্রতি বছরই নিজের অক্ষের চার দিকে মঙ্গলের আবর্তনের গতি বাড়ছে। যার ফলে ক্রমে ছোট হচ্ছে লাল গ্রহের দিনের দৈর্ঘ্য। ঠিক কেন বছর বছর মঙ্গলের আবর্তনের গতি বাড়ছে, বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। কিন্তু যে ভাবে তাঁরা পৃথিবীতে থেকে রেডিয়ো-তরঙ্গ মঙ্গলে পাঠিয়ে, সেখানে আগে থেকেই বসিয়ে রাখা ‘ইনসাইট’ ল্যান্ডারে তা প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে ফেরত এনে তবে এই সূক্ষ্ম ফারাক ধরতে পেরেছেন, তা-ও নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য।

সেই খুলি যেমন দেখতে

মানুষের অচেনা আত্মীয়

চিন দেশে প্রায়শই আদিম মানুষের এমন জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায়, যারা মানুষের বিবর্তনের চেনা ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না। ২০১৫ সালেও এমন একটা চোয়ালের হাড়ের জীবাশ্ম সেখানে পাওয়া গেছিল। এত বছর ধরে তাকে খুঁটিয়ে পরখ করে নৃতত্ত্ববিদরা বলছেন, ওই চোয়ালের মালিক পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াত অন্তত ৩ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু অত বছর আগে মানুষের যে পূর্বপুরুষদের ওই অঞ্চলে থাকার কথা, তাদের সঙ্গে এই চোয়ালের মালিকের কোনও মিল পাওয়া যাচ্ছে না। বার বার এমন বেখাপ্পা জীবাশ্ম পেলে খটকা লাগে। বোঝা যায়, মানুষের বিবর্তনের যে ইতিহাস আমরা জেনে ফেলেছি বলে মনে করছি, তাতে এখনও ফাঁকফোকর আছে। সব প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনও জানি না।

মসের দুর্দিন

ভারতবর্ষ চির কাল এশিয়া মহাদেশের অংশ ছিল না। আজ থেকে প্রায় ৪-৫ কোটি বছর আগে ভূ-ত্বকের পাতের নড়াচড়ার ফলে ভারতীয় পাত এসে ধাক্কা মেরেছিল ইউরেশীয় পাতে। এই সংঘর্ষের ফলেই দুই পাতের সংযোগস্থলের মাটি ক্রমে ঊর্ধ্বমুখে উঠে হিমালয় পর্বতমালার জন্ম দেয়। সেই হিমালয়েই বিজ্ঞানীরা ‘টাকাকিয়া’ নামে এক ধরনের মস (শ্যাওলার মতো দেখতে গাছ, কিন্তু শ্যাওলা নয়) পেয়েছেন, যারা অন্তত সাড়ে ষোলো কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে আছে। হিমালয় তৈরি হওয়ার সময় সমতল থেকে ধীরে ধীরে এদের উঠে পড়তে হয়েছিল একেবারে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়। মারাত্মক প্রতিকূল সেই পরিবেশেও মানিয়ে নিয়ে এই মস বেঁচে ছিল এত দিন। কিন্তু জলবায়ুর সাম্প্রতিক, আকস্মিক পরিবর্তনে ইদানীং ওরা বিপদের মুখে। ডায়নোসরদের মৃত্যু, হিমালয় পর্বতমালার জন্ম, সবের সাক্ষী মস আজ কিনা মানুষের কার্যকলাপে মৃত্যুমুখে!

টাকাকিয়া

বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞানের নানা শাখায় নিরন্তর ঘটে চলেছে নানা ঘটনা। তারই কিছু খবর রইল এই পাতায়।

সবচেয়ে দূরের তারার ফটো

জেমস ওয়েবের তোলা সেই ফটো

কোটি কোটি ডলার খরচ করে আকাশে পাঠানো জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্রহ্মাণ্ডের দূরদূরান্তের ক্ষীণ আলোও শনাক্ত করতে পারে। আলো ব্রহ্মাণ্ডে দ্রুততম, ফলে জেমস ওয়েবের আয়নায় আজ যে আলো এসে আছড়ে পড়ছে, সে হয়তো উৎস থেকে যাত্রা শুরু করেছিল কোটি কোটি বছর আগে। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকে এক ধরনের টাইম মেশিন বলেন। ওয়েবের তোলা একটা ফটোয় বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন এমন এক দূরের তারাকে, যে আলো ছড়াচ্ছিল বিগ ব্যাং নামের মহা বিস্ফোরণের মাত্র একশো কোটি বছর পরেই। এখনও অবধি খুঁজে পাওয়া পৃথিবী থেকে দূরতম এই তারার নাম রাখা হয়েছে ‘এরেন্ডেল’। এর আগে হাবল টেলিস্কোপও এরেন্ডেলকে দেখেছিল, তবে জেমসের মতো এত ভাল ফটো হাবল তুলতে পারেনি। জানা গেছে এও যে, আমাদের সূর্যের চেয়ে এরেন্ডেল প্রায় দ্বিগুণ গরম আর লক্ষ গুণ উজ্জ্বল।

অচ্যুত দাস

রাহুল দ্রাবিড় ও রোহিত শর্মা

কতটা প্রস্তুত কোচ দ্রাবিড়?

সামনেই বিশ্বকাপ। ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের ধারাবাহিকতার অভাব ভাবাচ্ছে? লিখেছেন **মধুরিমা সিংহ রায়**

বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে নিয়ে প্রতিবেদন লিখতে বসে ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে উঠছিল নানা মুহূর্ত। প্রথমেই মনে পড়ল, ইডেন গার্ডেন্সে প্রায় অপরাজেয় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভিভিএস লক্ষ্মণ ও রাহুল দ্রাবিড়ের সেই অমর পার্টনারশিপ, যা প্রায় কোমায় চলে যাওয়া ভারতীয় দলকে প্রাণশক্তি দিয়েছিল। টেস্টে ২০০২-এর ওভালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২১৭, ২০০৪-এ রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৭০, ১৯৯৭-এ এক দিনের ক্রিকেটে পাকিস্তানের সেরা বোলিং অ্যাটাকের বিরুদ্ধে ১০৭, ১৯৯৯-এ নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫৩... তাঁর ব্যাটিং-জীবনের মণিমুক্তোর হিসেব করা অসম্ভব! তবে প্রায় নির্ভুল, জনমানসে অসম্ভব শ্রদ্ধার্জন করা এক জন ক্রিকেটারের জীবনে প্রথম ধাক্কা এল তাঁর অধিনায়কত্বের সময়ে। তখনকার কোচ গ্রেগ চ্যাপেলের সঙ্গে অধিনায়ক রাহুলের সমীকরণ নিয়ে লেখা হয়েছিল। যিনি বছরের পর-বছর ব্যাটিং ক্রিজ়ে বুক চিতিয়ে লড়েছেন, তিনি কী ভাবে গ্রেগ চ্যাপেলের প্রভাবে পড়লেন, তা নিয়ে জল্পনাও ছিল। অধিনায়ক রাহুলের অনেক সিদ্ধান্তে (বা হয়তো গ্রেগ-রাহুলের যৌথ সিদ্ধান্ত) দলের মধ্যে নাকি বিভাজনের পরিবেশ, অস্থিরতা তৈরি হয়। তার প্রভাব পড়ে খেলায়। ব্যাটার হিসেবে রাহুল যতটা সফল, অধিনায়ক হিসেবে তার ধারেপাশেও নেই তাঁর রিপোর্ট কার্ড।

এ সব পুরনো কথা এখন কেন? কারণ, আবারও দ্রাবিড় নেতৃত্বে। তবে মাঠের বাইরে। অনূর্ধ্ব উনিশের কোচ হিসেবে তাঁর পারফরম্যান্স খুবই ভাল। কে এল রাহুল থেকে সঞ্জু স্যামসন... ভারতীয় দলের বহু উঠতি তারকাই স্বীকার করেছেন, দ্রাবিড়ের কোচিং তাঁদের কতটা সাহায্য করেছে। কিন্তু সিনিয়র দলের হেড কোচ হিসেবে যে দ্রাবিড়কে দেখছি, তা যে বার বার গ্রেগ চ্যাপেলের আমলের অধিনায়ক দ্রাবিড়কে

মনে করিয়ে দিচ্ছে! সামনেই বিশ্বকাপ। তার আগে কোচের ফর্ম চিন্তায় রাখছে ভারতীয় শিবিরকে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, দ্রাবিড় ভাল কোচ, তাঁকে আর-একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর প্রাক্তন সতীর্থদের অনেকেই, যেমন সহবাগ, যুবরাজ সিংহ বা হরভজন সিংহের মতো খেলোয়াড়রা 'কোচ' দ্রাবিড়কে নিয়ে একটু সন্দিহান। কোচ হিসেবে তাঁর পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে এই সন্দেহ অমূলক মনে হবে না। ২০২২-এর এশিয়া কাপে সুপার ফোর স্টেজে বিদায়, গত বছর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে হেরে বিদায়, ২০২৩-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ২০৯ রানে হার... ঘরের মাঠে কিছু ম্যাচে জয় পেলেও বিদেশে ধারাবাহিকতা কোথায়? ২০২১-২২ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তাঁর কোচিংয়ে প্রথম টেস্ট জিতলেও তার পর টেস্ট ও এক দিনের সিরিজে বেসামাল অবস্থা ছিল দলের। আসন্ন এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ যে কোচ দ্রাবিড়ের কাছে অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বড় মঞ্চে কেমন পারফর্ম করেন, তার উপরই নির্ভর করবে কোচ হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ। ২০১৫-২০১৯ অবধি অনূর্ধ্ব উনিশের কোচ হিসেবে চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছিলেন। তখন দ্রাবিড় জোর দিতেন রিজ়ার্ভ বেঞ্চ শক্তিশালী করার দিকে। চাইতেন, জাতীয় দলে একই ভূমিকায় যেন একাধিক খেলোয়াড়ের অপশন তৈরি থাকে। সঙ্গে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা নিয়ে এগোতেন। কিন্তু সিনিয়র দলে কোচ দ্রাবিড়ের নানা সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকেই। যেমন, আইপিএল-এ সাফল্যের পর ঋতুরাজ গায়কোয়াড়কে সে ভাবে জাতীয় দলে পাওয়া যায়নি। সূর্যকুমার যাদব শ্রেয়স আইয়ারের বদলি হিসেবে নাগপুর টেস্টে ভাল খেললেও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ডাক পাননি। আবার প্রায় ষোলো মাস পরে একটি মাত্র ম্যাচ খেলার পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচের জন্য হঠাৎই সহ-অধিনায়ক হয়ে যান অজিঙ্ক্য রাহানে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বাদ পড়া আর-এক উদাহরণ। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে ব্যর্থতার দায় কোনও এক জনের উপর কোনও ভাবেই চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আর তা ছাড়া পরের প্রজন্মকে তৈরি করতে শুধু জাতীয় দলের কোচের ভূমিকা থাকতে পারে না। পৃথ্বী শ, শুভমন গিল, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়স আইয়ার বা সরফরাজ় খানের মতো নতুন তারকাদের মধ্যে শুভমন ও খানিকটা শ্রেয়স ছাড়া সে ভাবে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন কে? এখন পাখির চোখ বিশ্বকাপ। এশিয়া কাপ প্রস্তুতির মঞ্চ। সেখানেই টিমকে জরিপ করে নিতে পারবেন দ্রাবিড়। বিশ্বকাপ যেহেতু ঘরের মাঠে, তাই প্রবল জনসমর্থন আর চেনা কন্ডিশন পাবেন। সঙ্গে রোহিত-বিরাটের কম্বিনেশন যদি ছন্দে থাকে, তা হলে তো কথাই নেই! বুমরাহ ও মহম্মদ শামি রয়েছেন যখন, টার্নিং ট্র্যাকের বাইরেও ভাল ফল করার সম্ভাবনা দলের। ওয়াশিংটন সুন্দর, উমরান মালিক, ইশান কিষন বা সূর্যকুমার যাদবকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে হবে। বেশি পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত না-নিয়ে, এখন লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার গেম প্ল্যানই কি ছকছেন দ্রাবিড়?

প্র্যাকটিসের মুহূর্তে দ্রাবিড়, আছেন বিক্রম রাঠৌর ও রোহিত শর্মা

গ্রেগ চ্যাপেলের সঙ্গে কথা বলছেন দ্রাবিড়, পিছনে ধোনি, সচিন, দীনেশ কার্তিক ও কুম্বলে

চিন্তামগ্ন দ্রাবিড়

ছোট ছোট খেলা

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

বিশ্ব তিরন্দাজিতে অদিতির সোনা

অদিতি স্বামী

বয়স সবে সতেরো। এখনও কৈশোরের গণ্ডি পেরোননি। অথচ এরই মধ্যে জুনিয়র এবং সিনিয়র বিশ্ব তিরন্দাজির দু'টি পর্যায়েই সোনা জিতে নজির গড়ে ফেলেছেন অদিতি স্বামী। গত জুলাই মাসে অনূর্ধ্ব ১৮ কম্পাউন্ড তিরন্দাজিতে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতে প্রথম নজর কেড়েছিলেন মহারাষ্ট্রের সাতারার এই মেয়ে। এ বার বার্লিনে সিনিয়র বিশ্ব তিরন্দাজিতে কম্পাউন্ড বিভাগে প্রথমে দলগত এবং পরে ব্যক্তিগত বিভাগে জোড়া সোনা জিতে নতুন ইতিহাস গড়েছেন অদিতি। দলগত লড়াইয়ে সেমিফাইনালে গত বারের চ্যাম্পিয়ন কলম্বিয়াকে হারানোর পরে ফাইনালে মেক্সিকোকে ২৩৫-২২৯ ফলে হারিয়ে সুরেখা ভেন্নাম, পরনীত কৌরকে নিয়ে দেশের হয়ে এই প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সোনা জিতেছেন অদিতি। ব্যক্তিগত বিভাগে মেক্সিকোর আন্দ্রেয়া বেকেরাকে ১৪৯-১৪৭ পয়েন্টে থামিয়ে দিয়ে জার্মানির বার্লিন থেকে দেশকে দ্বিতীয় সোনাটি এনে দিয়েছেন অদিতি। সেমিফাইনালে তিনি হারিয়ে দেন ভারতীয় দলে তাঁরই সতীর্থ এবং আদর্শ খেলোয়াড় সুরেখা ভেন্নামকে। গণিতের শিক্ষক বাবা গোপীচন্দ চাইতেন মেয়ে খেলাধুলো করুক। মাত্র এগারো বছর বয়সে হাতে তির আর ধনুক তুলে নেন অদিতি। মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে আজ তিনিই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সোনাজয়ী উচ্ছ্বসিত অদিতির নজরে এ বার এশিয়ান গেমস।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন বুফন

অবশেষে ফুটবলকে গুডবাই জানালেন তিনি। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে গ্লাভস জোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন ইটালির বিশ্বজয়ী গোলরক্ষক কিংবদন্তি ফুটবলার জানলুইজি বুফন। ১৯৯১ সালে ইটালির ক্লাব পারমার ফুটবল অকাদেমি দিয়ে তাঁর ফুটবলার হওয়ার শুরু। ১৯৯৫ সালে পারমার সিনিয়র দলের হয়ে শুরু করেছিলেন পেশাদার ফুটবল। দু'বছরের মধ্যেই ১৯৯৭ সালে তাঁর গায়ে উঠেছিল জাতীয় দলের জার্সি। এর পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দীর্ঘ একুশ বছর তিনি ছিলেন ইটালির জাতীয় দলের গোলরক্ষক। ২০০৬ সালে ফ্রান্সকে হারিয়ে ইটালির বিশ্বকাপ জয় বুফনের ফুটবল জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। ২০০১ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত ক্লাব ফুটবলে দীর্ঘ উনিশটা বছর কাটিয়েছেন জুভেন্টাসে। এই ক্লাবের হয়ে জিতেছেন দশটি সিরি-আ লিগ। ইটালির এই ঘরোয়া লিগে সর্বোচ্চ ৬৫৭টি ম্যাচ খেলার রেকর্ড আছে তাঁর। যে পারমায় ফুটবল শুরু করেছিলেন সেই ক্লাব থেকেই ফুটবলকে বিদায় জানালেন তিনি। দেশের হয়ে খেলেছেন ৫টি বিশ্বকাপ। ২০১৮ ও ২০২২, পর পর দু'টি বিশ্বকাপে ইটালি যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ না হলে তিনিই হয়ে যেতেন ৬টি বিশ্বকাপ খেলা বিশ্বের এক মাত্র ফুটবলার।

জানলুইজি বুফন

হকিতে সেরা ভারত

ভারতীয় দল

নাটকীয় লড়াইয়ে মালয়েশিয়াকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। চেন্নাইয়ে ছয় দলের এই প্রতিযোগিতায় রাউন্ড রবিন লিগে চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তানের মতো দলগুলোকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে ওঠে হরমনপ্রীত সিংহ, আকাশদীপ সিংহরা। সেমিফাইনালে জাপানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হয় ভারত। ম্যাচের শুরুর দিকেই যুগরাজ সিংহের গোলে এগিয়ে গেলেও এক সময় পর পর দু'টি গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে ভারত। কিন্তু এর পরই হরমনপ্রীত, গুর্জন্ত সিংহ এবং আকাশদীপের গোল কোচ ক্রেগ ফুল্টনের ভারতকে চতুর্থ বারের জন্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এনে দেয়।

জিমন্যাস্টিক্সে পুরনো ছন্দে বাইলস

সিমোন বাইলস

জিমন্যাস্টিক্সের ফ্লোরে ফিরে আবার পুরনো ছন্দে সিমোন বাইলস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই তারকা জিমন্যাস্ট প্রায় দু'বছর পরে প্রতিযোগিতায় নেমে দুরন্ত সাফল্য এনে নজর কেড়ে নিলেন। শিকাগো শহরে ইউএস ক্লাসিক্স জিমন্যাস্টিক্সে নেমে আবার সোনার পদক পেলেন। অল রাউন্ডে ৫৯.১০০ পয়েন্ট স্কোর করে জিতে নিলেন ইউএস ক্লাসিক্স খেতাব। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর ১৯টি সোনা আছে। অলিম্পিক্সে আছে ৪টি সোনা সহ ৭টি পদক। কিন্তু গত ২০২০ টোকিয়ো অলিম্পিক্সে তাঁকে সেই ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২০১৬ রিয়ো অলিম্পিক্সে প্রথম বার নেমেই একটার পর-একটা সোনা জিতে চমকে দেওয়া মেয়েটি টোকিয়োয় নিজের সেরাটা দিতে পারেননি। শোনা যায়, তিনি মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। এখনও তাঁর থেরাপি চলছে। সংবাদমাধ্যমে এ কথা নিজেই জানিয়েছেন ছাব্বিশ বছরের এই মার্কিন জিমন্যাস্ট। তবু আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে ফ্লোরে ফিরেছেন। আগামী বছর প্যারিস অলিম্পিক্স। তার আগে ইউএস চ্যাম্পিয়নশিপ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। বাইলসের নজর এখন সে দিকেই।

বিশ্বকাপ মাতালেন লিন্ডা

অস্ট্রেলিয়া-নিউ জ়িল্যান্ডে যৌথ ভাবে অনুষ্ঠিত এ বারের মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল নানা দিক থেকে স্মরণীয়। চার বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আমেরিকা, দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি কিম্বা এক বার করে বিশ্বজয়ী নরওয়ে বা জাপান নয়। এ বার নতুন এক বিশ্বজয়ী দলকে দেখবে ফুটবল দুনিয়া। বিশ্বজয়ের স্বপ্নপূরণ হয়নি লিন্ডা কাইসেডোর। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে কলম্বিয়াকে। খেলতে নেমে মাঠ মাতিয়েছেন কলম্বিয়ার এই আঠারো বছরের ক্যান্সারজয়ী ফুটবলার। দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে এ বার বিশ্বকাপে বড় অঘটন ঘটায় কলম্বিয়া। ম্যাচের বাহান্ন মিনিটে বক্সের মধ্যে থেকে দর্শনীয় বাঁক খাওয়ানো শটে এক অবিশ্বাস্য গোল করে নজর কাড়েন লিন্ডা। এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধেও একটি অসাধারণ গোল করেন। ভারতের মাটিতে অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়কত্বেই খেলতে এসেছিল কলম্বিয়া। ফাইনালে স্পেনের কাছে হেরে গেলেও লিন্ডার উত্থান থেমে থাকেনি। পনেরো বছর বয়সে শরীরে মারণরোগ বাসা বাঁধে। কিন্তু কোনও বাধাই তাঁর কাছে বাধা হয়ে ওঠেনি।

লিন্ডা কাইসেডো

পিভি সিন্ধু

সিন্ধুর সামনে বিশ্বকাপ

২১অগস্ট থেকে ২৭ অগস্ট ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে বসছে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের আসর। ২০১৩ সালে এই কোপেনহেগেনেই বিশ্বকাপে প্রথম ব্রোঞ্জ পদক জিতে নজর কেড়েছিলেন পিভি সিন্ধু। আটাশ বছরের এই ভারতীয় শাটলার বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে ১টি সোনা এবং ২টি করে রুপো ও ব্রোঞ্জ পদকের মালিক। অলিম্পিক্সে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতে জোড়া পদক জিতেছেন। কিন্তু এ বার খুব ভাল ফর্মে নেই তিনি। বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের ক্রমতালিকায় দু' নম্বর থেকে নামতে নামতে এখন সিন্ধু ১৭ নম্বরে। চোট সারিয়ে মাস পাঁচেক পরে কোর্টে ফিরলেও তেমন সাফল্য নেই তাঁর। বিশ্বকাপে এ বার তাই কঠিন লড়াইয়ের সামনে সিন্ধু।

নজির গড়ার দৌড়ে ম্যান সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

শুরু হয়েছে মরসুমের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। নামী দলগুলোর অনেকেই মাঠে নেমে পড়েছে। এ বার টানা চতুর্থ বার প্রিমিয়ার লিগ জিতে অনন্য নজির গড়ার দৌড়ে নেমেছে জোসেপ পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। গত মরসুমে ইপিএলে 'ত্রিমুকুট' জয় করেছিলেন আর্লিং হালান্ড, রদ্রিরা। ইপিএল, এফএ কাপ জয়ের পরে বড় জয় এসেছিল উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। দুর্দান্ত খেলেছিলেন নরওয়ের আর্লিং হালান্ড। ইপিএল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বাধিক গোল করায় ইপিএলের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ও ইউরোপের সোনার বুট ওঠে তাঁরই হাতে। ইপিএলে গত ছ'বারের মধ্যে পাঁচ বারই লিগ জিতেছে গুয়ার্দিওলার ম্যান সিটি। এর মধ্যে টানা তিন বার। এ বার তাই প্রথম দল হিসেবে টানা চতুর্থ বার ইপিএল জয়ের সামনে আর্লিং হালান্ডরা। টানা চার বার লিগ শিরোপা জয়ের কৃতিত্ব ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অন্য কোনও দলের নেই। তেরো বার লিগজয়ী দল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এর আগে দু'বার এমন সম্ভাবনা তৈরি করেও সাফল্য পায়নি। গত বারের অধিনায়ক জার্মানির ইকে গুন্দোগান দল ছেড়ে বার্সায়, আর এক ফুটবলার রিয়াদ মাহরেজ সৌদি ক্লাবে। তবু দল যথেষ্টই শক্তিশালী। অবনমনের কারণে এ বার ইপিএলে নেই লেস্টার, লিডস এবং সাউদাম্পটন ক্লাব। অন্য দিকে উঠে এসেছে বার্নলি, লুটন টাউন এবং শেফিল্ড দল। বার্নলিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল করে যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই যেন নতুন অভিযান শুরু করে দিয়েছেন আর্লিং হালান্ড।

চন্দন রুদ্র

নতুন খেলা

১

২

৩

৪

ব	ড়	দি	ন
রা	ঙা	আ	লু
ব	জ্র	পা	ত
র	স	গো	ল্লা

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পর পর খোপে লিখে ফ্যালো। এ বার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এ বারের সঙ্কেত : শিল্পী। মিস্ত্রি।

২০ জুলাই সংখ্যার সমাধান

বরাবর

Go Figure

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ১০ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায় পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

২০ জুলাই সংখ্যার সমাধান :

সহজ: ৫ + ২ – (৪ + ৩) = ০

মাঝারি: (৩ × ২) + (১৩ – ৭) = ১২

কঠিন: (১৬ ÷ ৮) × (২১ ÷ ৭) = ৬

বৈশালী পোদ্দার, *অষ্টম শ্রেণি, অগাক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।* **বিতান পোদ্দার,** *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।* **রাজর্ষি সাহা,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম রহড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।* **দেবার্ঘ্য মণ্ডল,** *পঞ্চম শ্রেণি, বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির।* **সমৃদ্ধি সাহু,** *পঞ্চম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির (উঃ মাঃ), যমুনাবালী, পঃ মেদিনীপুর।* **সপ্তক ঘোষ,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, বোলপুর হাই স্কুল।* **অদ্রীশ মাইতি,** *চতুর্থ শ্রেণী, সরস্বতী শিশু মন্দির, বক্সীবাজার, মেদিনীপুর।* **মহ. ঈশান আলি,** *অষ্টম শ্রেণি, মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল।* **স্বর্ণদীপ রায়চৌধুরী,** *প্রথম শ্রেণি, মাতৃ শক্তি শিক্ষা কেন্দ্র, বরানগর।* **শৌর্যেশ চট্টোপাধ্যায়,** *দ্বিতীয় শ্রেণি, শ্রীঅরবিন্দ এডুকেশন সেন্টার, পুরুলিয়া।* **সুস্নাতা চট্টোপাধ্যায়,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স পাবলিক স্কুল, বাগনান, হাওড়া।* **তিতাস সিংহ,** *পঞ্চম শ্রেণি, কনকপুর হাই স্কুল, মুরারই, বীরভূম।* **স্পন্দন ভাদুড়ী,** *পঞ্চম শ্রেণি, বিড়লা হাই স্কুল, কলকাতা।*